হিন্দু-আচার-ব্যবহার।

পারিবারিক ও সামাজিক।

শ্রীমনোমোহন বসু-প্রণীত।

দ্বিতীয় মুদ্রাঙ্কণ।

কলিকাতা।

৩৩ নং করন্‌ওয়ালিস্‌ ষ্ট্রীট, মধ্যস্থ যন্ত্রে

বেঙ্গল্‌-পব্‌লিশিং কোম্পানি দ্বারা মুদ্রিত ও প্রকাশিত।

চৈত্র, ১২৯২ সাল। ইং এপ্রেল ১৮৮৬।

প্রকাশকদিগের বিজ্ঞাপন।

২০শে চৈত্র, ১২৯৩ সাল।

সুপ্রসিদ্ধ লেখক ও বাগ্মী বাবু মনোমোহন বসু মহাশয় প্রণীত এই "হিন্দু-আচার-ব্যবহার" প্রবন্ধটী দুই ভাগে বিভক্ত। প্রথম "পারিবারিক"; দ্বিতীয় "সামাজিক"। প্রত্যেক ভাগ পৃথক্ বক্তৃতার বিষয় হইয়াছিল—"পারিবারিক" ভাগটী বাঙ্গালা ১২৭৯ সালের ১৭ই আশ্বিনে "জাতীয় সভা" স্থলে এবং "সামাজিক" ভাগটী ঐ সালের ফাল্গুন মাসে "হিন্দুমেলা" নামক জাতীয় মেলাস্থলে বিবৃত হয়। তন্মধ্যে কেবল প্রথম ভাগটী বক্তৃতাকালের অনতি-বিলম্বেই পুস্তকাকারে প্রচারিত হয়। দ্বিতীয় "সামাজিক" ভাগটী নানা কারণে তদ্রূপ আকারে তখন প্রকাশ পায় নাই। প্রথম ভাগের প্রথম মুদ্রিত পুস্তক-গুলি কয়েক বৎসর হইল নিঃশেষিত হইয়াছে। পুস্তকবিক্রেতাগণের নিকট শুনা যায়, বহু বহু গ্রাহক সে পুস্তকের নিমিত্ত বিশেষ আগ্রহ প্রকাশ করিয়া থাকেন। তদভাব নিবারণার্থ "পারিবারিক" ও "সামাজিক" উভয় ভাগই একত্র মুদ্রিত করিয়া অদ্য আমরা এই সম্পূর্ণ "হিন্দু-আচার-ব্যবহার" প্রচার করিলাম।

যৎকালে এই দুই বক্তৃতা বিবৃত হয়, তখন "জাতীয় সভা" ও "জাতীয় মেলা"র অত্যন্ত অভ্যুদয়ের সময়। দুই বারেই সভাবাজারের স্বর্গগত সুপ্রসিদ্ধ রাজা কালীকৃষ্ণ দেব বাহাদুর সভাপতি ছিলেন। তত্তৎসভাস্থলে মনোমোহন বাবুর বক্তৃতা কিরূপ আদরে গৃহীত হইত এবং সহস্র সহস্র শ্রোতা তচ্ছ্রবণে কিরূপ উত্তেজিত ও বিমোহিত হইতেন, তাহা যাঁহারা স্বচক্ষে না দেখিয়াছেন, সুদ্ধ বর্ণনা দ্বারা তাঁহাদের হৃদ্বোধ জন্মানো ভার।

প্রথম ভাগের প্রচার মাত্র বহু বহু সংবাদ ও সাময়িক পত্র তৎপ্রশংসাবাদে পূর্ণিত হইয়াছিল। স্থান থাকিলে তত্তাবৎ উদ্ধৃত করিয়া সুখী হইতাম। ফলতঃ মনোমোহন বাবুর বক্তৃতা মাত্রই যে সর্ব্বহৃদয়গ্রাহী, তাহা আর অভিজ্ঞ সাধারণকে বলিয়া দিতে হইবে না। গত বৎসর চৈত্র সংক্রান্তি দিবসে বিখ্যাত গুপ্ত-বৃন্দাবনে বা সাতপুকুরের বাগানে যে বৃহতী সভা হয়, মনোমোহন বাবু তাহার সভাপতি পদে বরিত হইয়া যে সকল বক্তৃতা করিয়াছিলেন, তাহা শুনিয়া গিয়া সর্ব্বদেশখ্যাত "অমৃতবাজার-পত্রিকা"র গুণজ্ঞ সম্পাদক মহাশয়

শীয় পত্রে এমন ভাব ব্যক্ত করেন যে "বঙ্গভাষায় মনোমোহন বাবুর ন্যায় সদ্বক্তা আর কেহই নাই।"

তদ্রূপ তাঁহার "বক্তৃতামালা" সম্বন্ধে বাগ্মী-প্রবর বাবু কালীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় সম্পাদিত তাৎকালিক "বেঙ্গল ক্রিশ্চিয়ান হেরাল্ড" পত্রে যাহা লিখিত হইয়াছিল, তাহার কিয়দংশ এস্থলে উদ্ধৃত না করিয়া থাকিতে পারিলাম না।

"A speech in the Bengalee language, worthy of the name, had, till lately, been a thing unknown. No wonder therefore, that public opinion had prejudicated the matter so far as to laugh to scorn any proposal made in its favor. To Babu Manomohana Basu, our excellent editor of the *Madhyastha*, belongs the credit of rescuing Bengalee speeches from the contempt in which they were held of our educated countrymen. We take leave now to congratulate him on his success in recommending, by the force of his own example, the cultivation of Bengalee eloquence. * * * We have carefully gone over the 111 pages covered by these speeches, and we have been struck with the purity and chasteness of the style; the evolution of the latent elasticity of our language in the expression of ideas foreign and intractable; the flights of eloquence, fiery and of the heart; the warmth of feeling, the earnestness of *purpose*, the zeal of *patriotism*, and the vein of *honesty*;—which mark Babu Manomohana's speeches. The last speech in which the duties of Teachers and of Scholars are enforced, is particularly instructive." *The Bengal Christian Herald, June 20th, 1873.*

অতএব সম্পূর্ণ ভরসা আছে, এমন বক্তার বক্তৃতাপুস্তক পুনঃপ্রচার দ্বারা সাধারণের বিরাগ-ভাজন হইব না, বরং তাঁহাদের নিকট প্রচুর অনুরাগ ও উৎসাহ লাভেই সমর্থ হইব।

হিন্দু-আচার-ব্যবহার।

জাতীয় সভায় বক্তৃতা।

বাবু মনোমোহন বসু কর্ত্তৃক

১২৭৯ সাল, ১৭ই আশ্বিনে বিবৃত।

হিন্দু আচার ব্যবহার—পারিবারিক।

"কেবলং শাস্ত্রমাশ্রিত্য নকর্ত্তব্যো বিনির্ণয়ঃ।
যুক্তিহীন বিচারেণ ধর্ম্মহানিঃ প্রজায়তে॥"

কেবল শাস্ত্রকে আশ্রয় করিয়া বিচার করা কর্ত্তব্য নহে, যুক্তিহীন বিচাব দ্বারা ধর্ম্ম হানি হয়।

বৃহস্পতি-স্মৃত্যুক্ত এই বচনই অদ্য আমাদের প্রবন্ধের শিরোভূষণ হউক। বিশেষে পাশ্চাত্য বিদ্যালোকের প্রভায় আ'জ্‌কা'ল্‌ সকল বিষয়ই পরিদৃশ্যমান হইতেছে। যে সমস্ত বিষয়ের প্রতি দেশের লোক কণামাত্র চিত্তার্পণ করিতেন না—যে সমুদয় ব্যাপার জ্ঞানমন্দিরের চতুষ্কোণে অন্ধকার ও জঞ্জালাবৃত হইয়া পড়িয়া থাকিত, ঐ বিদ্যার প্রখর বিমল জ্যোতিতে তাহাও লোকে দেখিতে পাইতেছে। যাহা না পাইতেছে, যাহা দূরে আছে, যাহা আবৃত আছে, যাহা সহজে প্রকাশ পায় না, তাহাও দেখিবার জন্য লোকে অনিবার্য্য আগ্রহাতিশয্য দেখাইতেছে—কোনো কোনোটীর জন্য নিতান্ত অধৈর্য্য হইয়া উঠিতেছে।

বিজ্ঞানের জন্য যত না হউক; শিল্পের জন্য যত না হউক; সমরকুশলতার জন্য যত না হউক; ধর্ম্মের জন্য, ঈশ্বর-তত্ত্বের জন্য, স্বজাতির হীনত্ব মোচন জন্য শিক্ষিত হিন্দু মাত্রেই মহা ব্যস্ত। যাঁহারা হিন্দুনাম ত্যাগ

করিয়াছেন, এমন হিন্দুবংশোদ্ভব ব্যক্তিগণও হিন্দু সমাজের উন্নতির আশায় মহা ব্যস্ত আছেন! চৌদিগেই ব্যস্ততা, চৌদিগেই চাঞ্চল্য, চৌদিগেই অভাব-বোধ, চৌদিগেই অভাব মোচনের যত্ন! সেই চৌদিগের কোনো কোনো দিগে এত উদ্যোগ, এত আড়ম্বর, এত অসহিষ্ণুতা, যে, এক বৎসরে—এক ঋতুতে—এক মাসে—একদিনে—আ! এই দণ্ডেই—এই মুহূর্ত্তেই হিন্দু সমাজ যদি মহাপ্লাবনের ন্যায় কোনো অলোক-সামান্য ঘটনায় বিপর্য্যস্ত হইয়া—আমূল উৎক্ষিপ্ত হইয়া—কোনো অভিনব নাম ও অভিনব স্বভাব ধারণ করে, তবেই তাঁহাদিগের অত্যুগ্র আগ্রহের শান্তি হইতে পারে! ফলতঃ পূর্ব্ব ও বর্ত্তমান আচার, ব্যবহার, রীতি, নীতি, সমাজ-পদ্ধতি মাত্রই পূর্ব্বোক্ত অপূর্ব্ব আলোকের আভায় অনেকের চক্ষে ও কল্পনায় এরূপ ভাবে দৃষ্ট হইতেছে, যেন তাহার সমস্তই অব্যবহার্য্য, অনার্য্য, অপকারক, সুতরাং ভদ্রলোকের অগ্রাহ্য! তত্তাবতের আভ্যন্তরিক কোনো গুণ আছে কিনা, তাহা সেই অগ্নি ভেদ করিয়া দেখাইতে পারে না। বহুকালের বাহ্যিক মলাতে আচ্ছন্ন, ভিতরেব কথা কে বলিতে পারে? ওতপ্রোতভাবে এবং বিদীর্ণ করিয়া না দেখিলে সার বস্তু অবশ্যই অদৃশ্য থাকা সম্ভব। যাঁহারা মনে করেন, সমুদায়ই দেখিলাম, সমুদায়ই চিনিলাম, ভালমন্দ বুঝিতে পারিলাম, তাঁহারা কতদূর দেখিয়া কিরূপ পরীক্ষাব জোরে এই কথা বলেন? সূক্ষ্মানুসূক্ষ্ম রূপে আভ্যন্তরিক ভাগ পরীক্ষা করিয়া কি বলেন? না, ঐ অনলের দীপ্তিতে বাহ্যভাগ যতটুকু দেখা যায়, তাহাই দেখিতে পাইয়া সন্তুষ্ট হইয়া এই সিদ্ধান্ত করেন? বোধ হয় শেষেরটীই হইবে। যদি শেষেরটী হয়, তবেতো সে দেখা দেখাই নয়! কিন্তু আশ্চর্য্য এই, কেহ যদি বলে, তোমাদের দেখা ঠিক দেখা হয় নাই, তবে তাঁহারা ঐ অনলকে—ঐ পাশ্চাত্য বিদ্যার অগ্নিরাশিকে—আরো দীপ্ত করিয়া দেন—তদ্দেশের দৃষ্টান্ত রূপ দাহ্য পদার্থ দিয়া সেই অগ্নিকে আরো প্রবল করেন, করিয়া বলেন, দেখ দেখি ঠিক দেখা হইয়াছে কি না? ফলতঃ সেই বিজাতীয় অগ্নির এমন একটী ধর্ম্ম আছে, তাহার আলো যত বাড়ে, দ্রষ্টব্য আচার ব্যবহারের গাত্র-মলা ততই বেশী দৃষ্ট হয়—তত্তাবতের প্রতি ঘৃণা সেই পরিমাণে আরো বাড়িতে থাকে—আপত্তি-কারীদের মুখের উপর আরো অট্টহাস, আরো আস্ফালন প্রকটিত হয়—

তখন সেই দৃষ্ট বস্তুগুলি "পদার্থই" নয়, এই সিদ্ধান্তটী হিন্দুর বেদ, মুসলমানের কোরাণ, খ্রীষ্টানের বাইবেলের ন্যায় অভ্রান্ত হইয়া উঠে!

কিন্তু সেই তেজোময়ী, অত্যন্ত দীপ্তিময়ী বিদ্যার অত তেজ না বাড়াইয়া স্বল্পমাত্র আলোকের মৃদু কিরণ দ্বারাই যদি আচার ব্যবহার গুলিকে নাড়িয়া চাড়িয়া, উল্টাইয়া পাল্টাইয়া, অভ্যন্তর ভাগ খুলিয়া থালিয়া দেখা যায়, তবে অবশ্যই আর এক প্রকার দেখাইবে—ভাল হ'ক্ মন্দ হ'ক্ একবারে সেরূপ ত্বক্কারজনক গাত্রমলার ন্যায় আর দেখাইবে না! সত্য সত্য কিছু আদিম কালের চূড়ান্ত সভ্যজাতির সামাজিক কার্য্য-প্রণালী এতই অসার—এতই বস্তুহীন—এতই ফোঁফ্রা হইতে পারে না! ভারতবর্ষের প্রসিদ্ধ ইতিহাসবেত্তা এল্‌ফিনিষ্টন সাহেব তন্ন তন্ন বিচারের পর রাজ্যশাসন ও সমাজ সম্বন্ধে গ্রীক-জাতির অপেক্ষা হিন্দুদিগের প্রাধান্য দেখাইয়া গিয়াছেন। তিনি বলেন ;—

"It might be easier to compare them with the Gaeeks, as painted by Homer, who was nearly contemporary with the compilation of the Code (মনু) ; and however inferior in spirit and energy, as well as in elagance, to that heroic race, yet, on contrasting their law and forms of administration, the state of the arts of life, and the general spirit of order and obedience to the laws, the eastern nation seems clearly to have been in the more advanced stage of society. Their internal institutions were less rude ; their conduct to their enemies more humane ; their general learning was much more considerable ; and in the knowledge of the being and nature of God, they were already in possession of a light which was but faintly perceived even by the loftiest intellects in the best days of Athens. Yet the Greeks were polished by free communication with many nations and have recorded the improvements which they early derived from each ; while the Hindu civilization grew up alone, and thus acquired an original and peculiar character, that continues to spread an interest over the higher stages of refinement to which its unaided efforts afterwards enabled it to attain. It may, however be doubted whether this early and independent civilization was not a misfortune to Hindus ; for seeing them-

selves superior to all tribes of whom they had knowledge, they learned to despise the institutions of foreigners and to revere their own, until they became incapable of receiving improvement from without, and averse to novelties even amongst themselves."

অতএব সেই দীপ্ত অগ্নিকে আর উদ্দীপ্ত করিও না, কি জানি অতিশয় উত্তাপে অঙ্গ দাহ, কি হয়তো গৃহ দাহ পর্য্যন্তও ঘটিতে পারে। আর যদি উদ্দীপ্তই করিবে, তবে শিল্প বিজ্ঞান প্রভৃতি দেশের প্রকৃত অভাব-বাচক পদার্থ দর্শনার্থেই উদ্দীপ্ত কর; তাহাতেই ইউরোপীয় জ্ঞানরূপ গ্যাসের আলোক বড় আবশ্যক; আমাদের সামাজিক আচার জন্য সে গ্যাসের প্রয়োজন কি? দেশীয় বর্ত্তিকাতেই সে কাজ হইতে পারে—তাহাতে যদি পরিষ্কার দেখিতে না পাও, না হয় ইউরোপীয় যুক্তি রূপ সামান্য কাচের আলোকাধার গ্রহণ করিলেই মনোভিলাষ পূর্ণ হইবে!

এই শেষোক্ত প্রণালীতে কার্য্য করিবার অভিপ্রায়েই দেশহিতেচ্ছু মহাশয়েরা এই "জাতীয় সভাকে" প্রতিষ্ঠিতা করিয়াছেন। সমাজের দোষ গুণ অল্পে অল্পে দর্শন, অল্পে অল্পে গুণের বর্দ্ধন, অল্পে অল্পে দোষের সংশোধন, অল্পে অল্পে সৌভ্রাত্র-রস স্বজাতি মধ্যে সিঞ্চন, অল্পে অল্পে স্বজাতীয় ধর্ম্ম ও সমাজ-বন্ধনকে দৃঢ়ী করণ, ইহাই এই সভার প্রধান উদ্দেশ্য। তাহা করিতে গেলে অগ্রে সমাজের ধর্ম্ম; পরে তাহার আচার ব্যবহার-তত্ত্বের তত্ত্বাবধান করিতে হয়। সে গুলি কি অবস্থায় ছিল এবং কি দশায় উপস্থিত, তাহা সন্ধান না করিলে—ক্ষত স্থানের মধ্যে শলাকা সন্নিবেশ না করিলে—রোগ কোথায়? কতদূর? আছে কি না? ইহা জানা যাইবে কিসে? ধর্ম্মের বিষয় গত অধিবেশনে সুযোগ্য অনুসন্ধায়ীর দ্বারাই অনুসন্ধান করা হইয়াছে। তাহাতে আশাতিরিক্ত ফল লাভ করা গিয়াছে *। সুতরাং পরবর্ত্তী জ্ঞাতব্য "হিন্দু আচার-ব্যবহার" বিষয়টীর তথ্য গ্রহণের আবশ্যকতা কয়েকজন চিন্তাশীল সভ্যের মনে স্বভাবতঃই উদিত হইল। বিষয়টী যেমন প্রয়োজনীয়, তেমনি গুরুতর। ইহার আলোচনা এই সভার দ্বারা অবশ্যই হওয়া উচিত। কিন্তু যেরূপ ব্যক্তির দ্বারা হওয়া আবশ্যক, তাহা ঠিক হইতেছে না। সভা-

* ইহার পূর্ব্ব সভায় সুপ্রসিদ্ধ ভাবুক রাজনারায়ণ বসু মহাশয় কর্ত্তৃক "হিন্দুধর্ম্মের শ্রেষ্ঠতা" নামক বক্তৃতা হয়।

স্থলে বক্তামাত্রেই শিষ্টাচারের বশে আপন অযোগ্যতা প্রথমেই যেমন জানাইয়া থাকেন, আমি সেরূপ মৌখিক লৌকিকতায় ইহা বলিতেছি না। এরূপ প্রবন্ধ-লেখককে আর্য্য-জাতির শাস্ত্রীয় জ্ঞানে সম্পূর্ণ অভিজ্ঞ হওয়া আবশ্যক। বর্ত্তমান বক্তা তাহাতে সম্পূর্ণ অনভিজ্ঞ। এরূপ লেখককে পূর্ব্ব কালিক ও আধুনিক সামাজিক ও ধর্ম্ম বিষয়ক ইতিহাসের জ্ঞানে সুপক্ক হওয়া চাই। অন্যের বলিবার পূর্ব্বে আপনিই স্বীকার করিতেছি, সেরূপ জ্ঞানের সহিত বক্তা দূরতর সম্বন্ধই রাখিয়া থাকে! প্রকৃত প্রস্তাবে এরূপ প্রস্তাবের লেখক বঙ্গীয় সমাজে দুই চারিজন পাওয়া যায় মাত্র। যদি বলেন, তবে কেন এমন দুরূহ কার্য্যের ভার গ্রহণ করিলে? ভার গ্রহণ করিবার দুইটী কারণ আছে।

তাহার প্রথম, যোগ্যব্যক্তিগণকে উত্তেজিত করা—তাঁহারা আলস্যে মৌন আছেন, সেই ঔদাস্য ভাঙ্গিয়া দেওয়া। এই প্রবন্ধ মধ্যে অবশ্যই অনভিজ্ঞতা ও অযৌক্তিকতা দোষ লক্ষিত হইবে, হইলে তখন, বত্রিশসিংহাসন-বর্ণিত মৌনবতীর মান ভঞ্জনের ন্যায়, তাঁহারা অন্যায় সহ্য করিতে পারিবেন না—অন্যায় সহ্য করা অলসেরও সাধ্য নয়—অন্যায় দেখাইতে কথা কহিবেন; কহিলেই বিষয়টীর সম্যগালোচনা হইয়া উঠিবে!

দ্বিতীয় কারণ, যথা সাধ্য সদ্বিষয়ে লিপ্ত হওয়া সকলেরই উচিত। অধিক সাধ্য, সম্পূর্ণ যোগ্যতা, যথোচিত ক্ষমতা নাই, তাতে কি? তাজমহলের ন্যায় পুরী নির্ম্মাণে অসামর্থ্য বশতঃ কি কেউ আর পুরী নির্ম্মাণ করিতেছে না? ইলোরার গুহা-খোদকের ন্যায় নৈপুণ্য নাই বলিয়া কি আর কেহ পাষাণের গায় বাঁটালীর আঁচড়টী দিতেছে না? না, কালীদাসের অলৌকিক প্রতিভা প্রাপ্ত না হইলে কেহই আর কাব্য রচনায় প্রবৃত্ত এবং তান্‌সানের ন্যায় অদ্ভুত শক্তি নাই বলিয়া কেহ আর সঙ্গীত ব্যাপারে নিযুক্ত হইতেছে না? ঢাকা আর শান্তিপুরে চমৎকার বস্ত্র বয়ন হয়, হউক; গ্রাম্য তাঁতি—গ্রাম্য যুগী সে ভয়ে ত্রিশ নম্বরের সূতা বুনন ছাড়িবে কেন? সুদ্ধ এই মহদ্দৃষ্টান্ত সম্মুখে পাইয়াই আমার আ'জ্ এই অসমসাহসিক কর্ম্মে প্রবৃত্ত হওয়া। এই দুইটী কারণ স্মরণ না হইলে কদাচই ইহাতে অগ্রসর হইতে পারিতাম না। অতএব সহস্র ত্রুটী হইলেও সহৃদয় শ্রোতৃবর্গের সদয় হৃদয় প্রশ্রয় দানে কদাচই বিমুখ হইবে না, এই প্রত্যাশায় প্রসঙ্গের আলোচনায় প্রবৃত্ত হইলাম।

বিষয় ভাগ।

আমি মানস করিয়াছি, এই প্রস্তাব লিখিতে ধর্ম্ম-প্রত্যয় ও ধর্ম্মবিচার হইতে যত দূর অন্তর থাকা সম্ভব তাহাই থাকিব। ইহাতে যে যে বিষয়ে হস্তক্ষেপ করা যাইবে, প্রয়োজনানুসারে তাহার পূর্ব্ব, মধ্য ও বর্ত্তমান অথবা পূর্ব্ব ও বর্ত্তমান অথবা সুদ্ধ বর্ত্তমান অবস্থার পরিদর্শন করিব। বিশদ করিবার জন্য প্রস্তাবকে শ্রেণীবদ্ধ করা উচিত। অতএব ইহাকে প্রথমতঃ দুই প্রধান ভাগে বিভক্ত করা যাইতেছে। প্রথম পারিবারিক। দ্বিতীয় সামাজিক। বিচার্য্য বিষয়গুলির মধ্যে কোনো কোনোটীর প্রকৃতি এরূপ যে, তাহা পারিবারিক ও সামাজিক উভ-ধর্ম্মাক্রান্ত; যেমন বিবাহ। কিন্তু বিবাহ সম্বন্ধীয় অধিকাংশ ব্যাপার পরিবারের সহিত সংশ্লিষ্ট এবং হিন্দু গৃহস্থের গৃহস্থালীর আদি সূত্র, এইজন্য ইহাকে পারিবারিক ভাগেই সন্নিবেশিত করাগেল। এই সঙ্কেতানুসারে যে বিষয়টী যেদিগে সমধিক সম্বন্ধ রাখে, তাহাকে সেই ভাগেই ফেলা গিয়াছে। ফলতঃ পারিবারিক ও সামাজিক ব্যাপার প্রায় একই বস্তু। আমাদের প্রয়োজন সাধন জন্যই পৃথক্ করা হইতেছে।

এই দুই ভাগই অদ্য আলোচিত হওনের কল্পনা ছিল। কিন্তু প্রথম ভাগ লিখিতে লিখিতে দেখা গেল, যে এক দিনের অধিবেশনে এই দ্বিভাগ-বিশিষ্ট সমুদয় প্রবন্ধটী পঠিত হইলে, শ্রোতৃবর্গের বৈরক্তির কারণ হইয়া উঠিবে। প্রথম যখন এই প্রবন্ধ লিখিবার কথা উঠে, তখনই বুঝা গিয়াছিল যে, এক দিনে ইহা হওয়া ভার। কিন্তু লিখিতে লিখিতে যেরূপ হইয়া উঠিল, সেরূপ যে হইবে, তখন স্পষ্ট বুঝা যায় নাই। নিস্প্রয়োজনে বেশী বর্ণনা হইয়া যে এরূপ ঘটিল, তাহা নহে। প্রস্তাবের অন্তর্গত প্রত্যেক প্রসঙ্গই গুরুতর ও বিস্তৃত। তাহার অধিকাংশেরই পূর্ব্ব বৃত্তান্ত কিছু জানা চাই। কোনো কোনোটীর সম্বন্ধে নানা দিগে নানা মত। তত্তাবতের সংক্ষিপ্ত উল্লেখ ও কিঞ্চিৎ কিঞ্চিৎ আলোচনা করিলেও বহু হইয়া পড়ে। সুতরাং প্রস্তাবটী নিজের প্রকৃতিতেই দীর্ঘ হইয়া উঠিয়াছে, লেখকের অনাবশ্যকীয় বাগাড়ম্বর জন্য নহে। বরং ইহার কোনো কোনো প্রত্যঙ্গ বাহুল্য ভয়ে, কোনো কোনো অঙ্গ যোগ্যতার অভাবে, কোনো কোনো অবয়ব সময়ের

স্বল্পতায় যথোচিত রূপে গঠিত না হওয়ায় ক্ষোভ রহিয়া গেল। ভরসা করি গুণজ্ঞ বুধমণ্ডলী সর্ব্বপ্রকার ত্রুটীর জন্যই ক্ষমা করিবেন।

এক্ষণে প্রথম ভাগকে আবার চারিটী উপভাগে বা পরিচ্ছেদে বিভক্ত করা আবশ্যক বোধ হইতেছে, যথা ;—

প্রথম। জাত কর্ম্মাদি বিবাহের পূর্ব্ববর্ত্তী সংস্কার।

দ্বিতীয়। বিবাহ।

তৃতীয়। সংশ্লিষ্ট পরিবার।

চতুর্থ। পরিবার মধ্যে পরস্পরের আচরণ ও অন্তঃপুরের আচার ব্যবহার ইত্যাদি।

প্রথম অধ্যায়।

জাতকর্ম্মাদি বিবাহের পূর্ব্ববর্ত্তী সংস্কার।

'জাত' শব্দ ব্যবহার করাতে সন্তান ভূমিষ্ঠ হওনের পরের কথাই বুঝাইবে না—গর্ভে জাত অর্থাৎ গর্ভ সঞ্চারাবধি সময়কেও গণ্য করিতে হইবে। অন্তঃসত্ত্বা অবস্থায় হিন্দু পরিবারে পূর্ব্বকালে কিরূপ আচরণ আচরিত হইত এবং এক্ষণেই বা কি হয়, তাহা দেখা কর্ত্তব্য। যে হিন্দু-গর্ভে ভীমার্জ্জুন রাম শ্যাম জন্মিয়াছিলেন, এখনও তো সেই হিন্দু-গর্ভ আছে, তবে কেন সে আকৃতি প্রকৃতির সন্তান ভূমিষ্ঠ হয় না, তাহা চিন্তা করিলে যত কারণ অনুভূত হয়, তন্মধ্যে পিতা মাতার দৈহিক অবস্থা সামান্য হেতু নহে। বহু পূর্ব্ব কালের হিন্দু মহাত্মারা তাহা সম্যগ্ বুঝিতেন। আয়ুর্ব্বেদ শাস্ত্রে লিখিত আছে ;—

অত্যাশিতোঽধৃতি ক্ষুব্ধঃ সব্যথাঙ্গঃ পিপাসিতঃ।
বালোবৃদ্ধোন্যরোগার্ত্তস্ত্যজেদ্রোগীচ মৈথুনং॥

অতিশয় ভোজী, ক্ষুধিত, চঞ্চল, বেদনাযুক্ত, পিপাসু, বালক, বৃদ্ধ এবং উৎকট রোগ-গ্রস্ত স্ত্রীপুরুষ এককালেই সহবাস পরিত্যাগ করিবে।

অতি প্রাচীন সংহিতাকার মনু মহাশয় উৎকট রোগ-গ্রস্তকে বিবাহ করিতেই এককালে নিষেধ করিয়াছেন। আধুনিক দর্শন-শাস্ত্রবিৎ ইউরোপীয় পাণ্ডিতগণের মতের সহিত ইহার সম্পূর্ণ ঐক্য আছে।

অতএব জনক জননীর দৈহিক অবস্থার উৎকর্ষ ভিন্ন সুস্থ বলিষ্ঠ সন্তানের আশা বৃথা। তদ্ব্যতীত গর্ভাবস্থায় গর্ভিণী-কর্ত্তৃক কয়েকটী সুনিয়ম পালন, অন্য কর্ত্তৃক গর্ভিণীর সুপালন এবং গর্ভ-দোহদস্বরূপ উপযুক্ত উপভোগাদি কারণগুলিও বড় সামান্য কারণ নহে।

বৈদ্যক ও ধর্ম্মশাস্ত্রে পরিষ্কার রূপে ব্যবস্থা করিয়াছেন যে, যে হেতু, প্রতি মাসে নারী পুষ্পিত হওনের চতুর্থ হইতে ষোড়শ দিন পর্য্যন্ত অপত্যোৎপাদনের কাল, তদতিরিক্ত সময়ে পরমাসের তদবটনা হওন পর্য্যন্ত দম্পতি-শয্যা পৃথক্ হওয়া আবশ্যক। "এবং তামভিসঙ্গম্য পুনর্মাসান্তজেদসৌ।" (আয়ুর্ব্বেদ) এইরূপ ব্যবস্থার ফল কথা এই যে, পরমাসে যদি গর্ভ সঞ্চারের লক্ষণ আভাষিত হয়, তবে সেই স্বতন্ত্র শয্যা দীর্ঘব্যাপী হইল—সন্তান হওয়া পর্য্যন্ত স্ত্রীপুরুষের অতি নৈকট্যভাব আর থাকিবে না। আর যদি পরমাসে তদ্রূপ লক্ষণ লক্ষিত না হয়, তবে চতুর্থ হইতে ষোড়শ দিন যাবৎ সেই পার্থক্যের কোনো আবশ্যকতা নাই। জরায়ু শয্যায় জীব-সঞ্চারের পর অহিত নিবারণের শুভ উদ্দেশেই এই সকল সুনিয়ম পূর্ব্বকালে প্রতিপালিত হইত।

ক্রমে এই শাসন শিথিল হইয়া ইতিপূর্ব্বে এতাবন্মাত্র সাবধানতা দৃষ্ট হইত, গর্ভ সঞ্চারের তিন চারি মাস পরে "কাণার মা আর কাণার বাপ" এক ঘরে শয়ন করিতেন না! আ'জ্ কা'ল্ আবার সে টুকুও নাই—এখনকার সুশিক্ষিতা জ্ঞান-গর্ব্বিতা তরুণীগণ যতক্ষণ প্রসব বেদনায় কাতরা না হন, ততক্ষণ পর্য্যন্ত স্বামীর পার্শ্ববর্ত্তিনী থাকিতে ক্ষান্ত হয়েন না! অপরস্বা কিং ভবিষ্যতি! ইহার পরে আরো বা কি হয়! ইহার পরে হয় তো সূতিকাগার প্রবেশ-কালে স্বামীকে ত্যাগ করিয়া যাইবেন না!

পুরাকালে এই শুভকর নিয়মের আনুকূল্যে পুষ্প, চন্দন প্রভৃতি সৌগন্ধ দ্রব্য, আদিরসাত্মক সঙ্গীত বা কাব্যাদি শ্রবণ, অনুপযুক্ত সখীসঙ্গ প্রভৃতি বিলাস-রসোদ্দীপক বস্তু ও ভাব-মাত্রই পরিত্যক্ত ছিল। অর্থাৎ অন্তর্ব্বত্নী কামিনীব স্বামী-সঙ্গ-ইচ্ছা যাহাতে না হয়, তদ্বিধান করা হইত।

অধুনা তন্মধ্যে কেবল পুষ্প ও আতর গোলাপাদি শুঁকিতে ও ব্যবহার করিতে চেতনী গিন্নীরা মানা করিয়া থাকেন! কিন্তু কেন যে তাহা ব্যবহার করিতে নাই, তাহা তাঁহারা জানেন না। এদিগে শাস্ত্রকারেরা যে কারণে উহা নিষিদ্ধ করিয়া গিয়াছেন, সে কারণের পিতা পিতামহ পর্য্যন্ত হইয়া যাইতেছে! তবে অকারণে উদ্দীপনের নিষেধ করিলে ফল কি?

তৎকালে এতদ্ব্যতীত আরো বহুবিধ শুভকারিণী সতর্কতার সমাশ্রয় লওয়া হইত। তদ্বিশেষ বলা এরূপ প্রবন্ধের আয়তনে সম্ভব নহে, কেবল কিঞ্চিৎ বুঝাইবার উদ্দেশে সুলভ পত্রিকোদ্ধৃত আয়ুর্ব্বেদোক্ত বচন নিম্নে উদ্ধৃত হইতেছে। যথা;—

গর্ভিণী প্রথমাদহ্নঃ প্রহৃষ্টা ভূষিতা শুচিঃ।
ভোজ্যন্তু মধুর প্রায়ং স্নিগ্ধং হৃদ্যং দ্রব্যং লঘু॥
সংস্কৃতং দীপনীয়ন্তু নিত্যমেবোপযোজয়েৎ।
গুর্ব্বিণী নতু কুর্ব্বীত ব্যায়ামমপতর্পণং॥
ব্যবায়ঞ্চ ন সেবত ন কুর্য্যাদতিতর্পণং।
রাত্রৌ জাগরণং শোকং যানস্যারোহণং তথা॥
রক্তমোক্ষং বেগরোধং ন কুর্য্যাদুৎকটাশনং।
মলিনাং বিকৃতাকারাং হীনাঙ্গীং ন স্পৃশেৎ স্ত্রিয়ং॥
নিজঘ্রেদপি দুর্গন্ধং ন পশ্যেন্নয়নাপ্রিয়ং।
বচাংসি নাপি শৃণুয়াৎ কর্ণয়োরপ্রিয়াণিচ॥
নান্নংপর্য্যুসিতং শুষ্কং ভুঞ্জীত ক্বথিতঞ্চযৎ।
চৈত্যশ্মশান বৃক্ষাংশ্চভাবাংশ্চাপ্যযশস্করান্॥
বহির্নিষ্ক্রামণং ক্রোধং শূন্যাগারঞ্চ বর্জ্জয়েৎ।
নোচ্চৈর্ব্রূয়াৎ ন তৎকুর্য্যাৎ যেন গর্ভো বিনশ্যতি॥
তৈলাভ্যঙ্গোদ্বর্ত্তনেচ নাত্যর্থং কারয়েদপি।
নম্রদ্বাস্তরণং কুর্য্যান্নাত্যুচ্চং শয়নাশনং॥ ইত্যাদি।

অস্যার্থঃ। গর্ভিণী নারী প্রথম দিবসাবধি অতি মনোহর বেশ ভূষা সমাধান পূর্ব্বক পরম প্রফুল্ল চিত্তে কালযাপন করিবেন। এবং অগ্নিসন্দীপনী সুমধুর স্নিগ্ধ লঘু দ্রব্য ভোজন করিবেন। ব্যায়াম, লঙ্ঘন, স্বামী-সম্ভোগ এবং অতিশয় স্নিগ্ধাদি সেবাও কদাচ করিবেন না। রাত্রি-জাগরণ, শোক, যানারোহণ, রক্ত-মোক্ষণ, মলমূত্রাদির বেগধারণ এবং উৎকট আহার পরিত্যাগ করিবেন। বিকৃতাকারা অঙ্গহীনা নারী ও নয়নের অপ্রিয় পদার্থ দর্শন করিবেন না এবং দুর্গন্ধ দ্রব্যের ঘ্রাণ লইবেন না। কর্ণের অপ্রিয় বাক্য শ্রবণ এবং পর্য্যুসিত শুষ্ক দুর্গন্ধ অন্ন ভোজন করিবেন না। ভয়ঙ্কর শ্মশান-ভূমির ভাব আন্দোলন, লোলচর্ম্ম কদাকার বৃদ্ধের মূর্ত্তি ভাবনা, অযশস্কর কর্ম্ম, বহির্গমন, শূন্য গৃহ, এই সকল পরিত্যাগ করিবেন। উচ্চকথা কহিবেন না, এবং যাহাতে গর্ভ বিনাশ হয় এরূপ কর্ম্ম ও অতিশয় তৈল মর্দ্দন করিবেন না। অত্যন্ত সুকোমল শয্যায় শয়ন করিবেন, কিন্তু তাহা অতিশয় উচ্চ করিবেন না, ইত্যাদি।

ইত্যাকার কত উপায়, কত নিয়ম, কত শুশ্রূষাই বিধিবদ্ধ ও ব্যবহারসিদ্ধ ছিল, তাহার কত উল্লেখ করিব। তৎপরে অন্যান্য দৈব মাঙ্গলিক আচারের তো কথাই নাই। আধুনিক ইউরোপীয় পণ্ডিতগণের নবাবিষ্কৃত মতের সহিত সহস্র সহস্র বৎসর পূর্ব্বের উক্ত ব্যবস্থার অধিকাংশ যে এতদ্রূপ সম-বেদনা-শীল, ইহাই আশ্চর্য্য! যে বুদ্ধির সাগরেরা বলেন, হিন্দু-আচার-ব্যবহার কিছুই নয়, উক্ত ব্যবস্থা-লিপি পাঠ করিয়া তাঁহাদের বুদ্ধির পায় নমস্কার করিতে কি ইচ্ছা হয় না? পঞ্চামৃত, কাঁচাসাধ, পাকা সাধ প্রভৃতি প্রথা কি নিন্দাস্পদ? এ সব কি শুভোৎসবের সোপান নয়? এ সব কি মাঙ্গল্য-ব্যঞ্জক চিত্তরঞ্জক অনুষ্ঠান নয়? যদি সন্তানের ভাবী প্রকৃতির বীজ জরায়ু-ক্ষেত্রেই অঙ্কুরিত হওয়া সম্ভব হয়; যদি গর্ভস্থ জীব গর্ভধারিণীর তাৎকালিক চিত্তবৃত্তি লইয়াই কর্ম্ম-ভূমিতে অবতরণ করে, একথা সত্য হয়; যদি তজ্জন্য প্রসূতিকে সাবধানে, স্বাস্থ্যে, সন্তোষে, সুখে রাখা কর্ত্তব্য হয়, তবে এসব কি নিরবচ্ছিন্ন তাহারি উত্তরসাধক সদুপায় নয়? এ সব পরিত্যাগ করিবার হেতু কি? যে দেশের বিদ্যা শিখিয়া এ দেশের সকলই দূষ্য বোধ হইতেছে, সে দেশে ইহা নাই বলিয়া কি এদেশেও থাকিবে না?

এক্ষণে সন্তান ভূমিষ্ঠ হওয়ার পর জাত-ক্রিয়াদি ও সূতিকাগার সম্বন্ধে যৎ-কিঞ্চিৎ বক্তব্য। শাস্ত্রে সূতিকাগৃহের কিরূপ নির্দ্দেশ আছে, তাহা নিশ্চয় করিতে আমি সাবকাশ পাই নাই। কেবল "সূতিকাগৃহাকৃতিঃ—অষ্টহস্তায়তং চারু চতুর্হস্ত বিশালকং।" চারি হস্ত প্রশস্ত, অষ্ট হস্ত আয়ত মনোহর সূতিকা-গৃহ হওয়া আবশ্যক, ইহাই স্মরণে আছে। ইহাই যথেষ্ট। যে প্রকার সূতিকা-গৃহ সচরাচর দৃষ্ট হয়, তাহা অশুচি ও অনাচারের ভয়ে অতি জঘন্যরূপে জঘন্য স্থলেই নির্ম্মিত হইয়া থাকে। তাহার পরিবর্ত্তন আপনা হইতেই হইয়া আসিতেছে এবং সেই পরিবর্ত্তনই নিতান্ত প্রার্থনীয়। সন্তান ভূমিষ্ঠ হইলে নাড়ীচ্ছেদ প্রভৃতি জাত-কর্ম্ম পূর্ব্বকালের ন্যায় অদ্যাপি কিছু কিছু প্রচলিত আছে। কিন্তু যেরূপ ধাত্রী এক্ষণে নিযুক্তা হয়, তাহা নিতান্ত পূর্ব্বকালের ব্যবস্থার বিপরীত। ধাত্রীর লক্ষণ এইরূপ লিখিত আছে,

সুবর্ণাং মধ্যবয়সাং সচ্ছীলাং মুদিতাং সদা।
শুদ্ধদুগ্ধাং বহুক্ষীরাং সবৎসামতিবৎসলাম্॥
স্বাধীনামল্পসন্তুষ্টাং কুলীনাং সজ্জনাত্মজাং।
কৈতবেন পরিত্যক্তাং নিজপুত্রদৃশাং শিশৌ॥

আয়ুর্ব্বেদ।

মধ্যবয়স্কা, সুশীলা, সর্ব্বদা হর্ষযুক্তা, বিশুদ্ধদুগ্ধা, সপুত্রা, অত্যন্ত দয়ান্বিতা, স্বাধীনা, অল্পে সন্তুষ্টা, সৎকুলোদ্ভবা, সজ্জন-দুহিতা, ছলরহিতা, শিশু প্রতি নিজপুত্রতুল্য দৃষ্টা, ইত্যাদিরূপ বহুগুণসম্পন্না ধাত্রীই প্রশস্তা।

অধুনাতন কালে ইহার সম্পূর্ণ বিরুদ্ধ প্রকৃতি আকৃতির ধাত্রীই নিযুক্তা হয়। অনুমান হইতেছে, পূর্ব্বকালে সূতিকাগার-বাসিনী হইলেই এক্ষণকার ন্যায় এমন অস্পৃশ্যা হইতে হইত না। অথবা তখন শিক্ষিতা ধাত্রী রমণীর স্বতন্ত্র শ্রেণী ছিল, নচেৎ এমন রূপ-গুণযুক্তা ধাত্রী কোথায় পাওয়া যাইত?

বাহুল্য ভয়ে ধাত্রী সম্বন্ধে আরো যে সব ব্যবস্থা এবং উপাখ্যান আছে, তাহা বলিতে পারিলাম না। সেই ব্যবস্থাতে স্পষ্ট আদিষ্ট হইয়াছে যে, যাহারা পরিষ্কৃত নয়, সদাচারিণী নয় এবং ভদ্র মহিলার সহচারিণীর যোগ্যা নয়, এমন সকল স্ত্রীলোককে ধাত্রী করিবে না। এখন অত্যন্ত ইতর লোকের

মেয়েরাই ধাত্রী হয়, সুতরাং যত জঘন্য হওয়া সম্ভব, তাহাই হইয়া থাকে। দেশস্থ লোকের এ বিষয়ে মনোযোগী হওয়া আশু কর্ত্তব্য।

অপিচ সূতিকালয়ের কতিপয় নূতন প্রথা যাহা প্রবর্ত্তিত হইয়াছে, ভদ্র লোকে তাহার অনুমোদন কদাচই করিতে পারেন না। সে সমস্ত লইয়া কাল হরণ করা বিধেয় নহে। অতএব তৎপরিত্যাগ পূর্ব্বক জাতানুষ্ঠানের আর দুই একটী কথার উল্লেখ করিয়া অন্যত্র গমন করা উচিত। পাঁচটি, আটকৌড়ে, নন্বা, ষষ্ঠী পূজাদির ব্যাপার ধর্ত্তব্যই নহে, স্ত্রীসমাজের সংস্কারাধীন মাঙ্গল্য-কর্ম্ম বিশেষ দোষাবহ হইতে পারে না। স্ত্রী সমাজ সুশিক্ষিত হইলে আপনা হইতেই তাহার যথোচিত সংস্করণ হইয়া আসিবে। তজ্জন্য যুক্তি, বিচার, বহুল বাগাড়ম্বরের কোনো প্রয়োজন নাই। সে সব আচার থাকিলেই বা কি, আর না থাকিলেই বা কি। কিন্তু গর্ভাবস্থার যে সমস্ত প্রকরণ পূর্ব্বে প্রদর্শিত হইয়াছে, অথবা বাহুল্য ভয়ে যাহা হয় নাই, তত্তাবতের প্রতি চিত্তার্পণ করা শিক্ষিত হিন্দু মাত্রেরই উচিত।

শুভ অন্নপ্রাশন ও নামকরণ অতীব প্রয়োজনীয় বিষয়। আমাদের বর্ত্তমান শিক্ষাগুরুদের দেশেও তদ্রূপ একটী প্রথা প্রচলিত আছে। সুতরাং নব্য সভ্যগণ তাহাতে আপত্তি না করিতেও পারেন! কেবল পৌত্তলিকতামূলক দেবার্চ্চনার জন্য যাহা কিছু গোল! কিন্তু ধর্ম্ম-প্রত্যয়ের কথায় স্বতন্ত্র থাকা যখন অভিপ্রায়, তখন তাহাব ইতিকর্ত্তব্যতার বিচার-ভার অন্যের উপর থাকিল। কেবল এই মাত্র বলিতে পারি, যখন শুদ্ধ হিন্দু সমাজের আচার ব্যবহারের বিষয় এই প্রবন্ধে বিচার্য্য, তখন অহিন্দুর কথা এস্থলে আসিতেই পারে না। তবে কেনই বা অন্নপ্রাশন, চূড়াকরণ, উপনয়ন, প্রভৃতি বিবাহের পূর্ব্ববর্ত্তী সংস্কারগুলিকে সুন্দর প্রথা বলিয়া উল্লেখ না করিব? এই সকল দেশাচার পূর্ব্বকালের বাহুল্য-ব্যাপারের তুলনায় এক্ষণে হীনাঙ্গ হইয়া উঠিয়াছে। কেবল মূলাংশে কতক নিয়ম সংরক্ষিত হয়; বোধ হয় ক্রমে আরো হ্রাস হইয়া যাইবে। পূর্ব্ব ও বর্ত্তমানের প্রভেদ বুঝাইবার জন্য বহু প্রাচীন মনু সংহিতার তদ্বিষয়ক ব্যবস্থা দুই চারিটী উদ্ধৃত হইল। যথা;—

প্রাঙ্নাভিবর্দ্ধনাৎ পুংসো জাতকর্ম্ম বিধীয়তে।
মন্ত্রবৎ প্রাশনঞ্চাস্য হিরণ্য মধু সর্পিষাং ॥ ২অ, ২৯ ॥

অস্যার্থঃ। বালক জন্মিবামাত্র নাড়ীচ্ছেদের পূর্ব্বে তাহার জাতকর্ম্ম নামে সংস্কার করিবেক ও সেই সময় মন্ত্রোচ্চারণ পূর্ব্বক সুবর্ণ, মধু ও ঘৃত ভোজন করাইবেক। এখন এ সব না করিয়াই একেবারে নাড়ীচ্ছেদ করে।

নামধেয়ং দশম্যাস্তু দ্বাদশ্যাং বাস্যকারয়েৎ।
পুণ্যে তিথৌ মুহূর্ত্তে বা নক্ষত্রে বা গুণান্বিতে ॥ ৩০ ॥

একাদশ বা দ্বাদশ দিবসে নামকরণ করিবেক, তাহাতে না পারিলে জ্যোতিঃশাস্ত্রোক্ত প্রশস্ততিথি, মুহূর্ত্ত ও নক্ষত্রে করিতে হইবেক।

মঙ্গল্যং ব্রাহ্মণস্য স্যাৎ ক্ষত্রিয়স্য বলান্বিতং।
বৈশ্যস্য ধনসংযুক্তং শূদ্রস্য তু জুগুপ্সিতং ॥ ৩১ ।

ব্রাহ্মণের মঙ্গলবাচক, ক্ষত্রিয়ের বলবাচক, বৈশ্যের ধনবাচক এবং শূদ্রের নিন্দাবাচক নাম রাখিবেক।

এখন এরূপ কিছুই নাই। সাতকড়ি, দোকড়ি, দোলগোবিন্দ, মানগোবিন্দ, যে জাতিতে যাহার যদৃচ্ছা, সে তাহাই রাখিয়া থাকে। উপাধি বিষয়েও ঐরূপ শর্ম্ম, বর্ম্ম, ভূতি ও দাসাদি মঙ্গল, বল, সম্পত্তি ও দাস্যবাচক উপপদ-যুক্ত করিবাব ব্যবস্থা ছিল। এখন ব্রাহ্মণের উপাধিতে বল ও পেসা বুঝায়, যথা চৌধুরী, হালদার, ঘটক ইত্যাদি। শূদ্রের উপপদে উচ্চতা, যথা দেব ও মিত্র ইত্যাদি। অপিতু—

স্ত্রীণাং সুখোদ্যমক্রূরং বিস্পষ্টার্থং মনোহরং।
মঙ্গলং দীর্ঘ বর্ণান্তমাশীর্ব্বাদাভিধানবৎ ॥ ৩৩ ॥

যে নাম সুখে উচ্চারিত হয়, ক্রূরার্থের বাচক না হয়, অনায়াসে যাহার অর্থ বোধ হয়, যাহাতে মনের প্রীতি জন্মে, যাহা মঙ্গলবাচক হয়, যাহার অন্তে দীর্ঘস্বর থাকে, যাহা উচ্চারণে আশীর্ব্বাদ বুঝায়, স্ত্রীলোকের এই প্রকার নাম রাখা কর্ত্তব্য। অধুনা এই নিয়ম প্রায়ই রক্ষিত হইয়া থাকে।

চতুর্থে মাসি কর্ত্তব্যং শিশোর্নিষ্ক্রমণং গৃহাৎ।
ষষ্ঠেঽন্নপ্রাশনং মাসি যদ্বেষ্টং মঙ্গলং কুলে ॥ ৩৪ ॥

জাত শিশুর চতুর্থ মাসে সূর্য্য দর্শন করাইবার জন্য সূতিকা-গৃহ হইতে নিক্রমণ নামা সংস্কার করিতে হয়, পরে ষষ্ঠ মাসে অন্নপ্রাশন নামক সংস্কার কর্ত্তব্য। অথবা আপনাদের কুলে যে সময়ে নিষ্ক্রমণাদি সংস্কার হইয়া থাকে, তাহা করিবেক।

তৎপরে প্রথম অথবা তৃতীয় বৎসরাদিতে চূড়াকরণের ব্যবস্থা ছিল।

তৎপরে গর্ভসঞ্চারের গণনায় অষ্টম বৎসরে অর্থাৎ ভূমিষ্ঠ হওনাবধি সওয়া ছয় বৎসরের পর সওয়া সাত বৎসরের মধ্যে ব্রাহ্মণ বালকের উপনয়-নের বিধি ছিল। ক্ষত্রিয়ের ঐরূপ গর্ভ গণনায় একাদশ বর্ষে ও বৈশ্যের দ্বাদশ বর্ষে হওয়া কর্ত্তব্য।

উপনয়ন সময়ে ব্রহ্মচর্য্যের যে রীতি, তদ্বিষয়ে কৃষ্ণসার চর্ম্মাদির উত্তরীয়, শণবস্ত্রের অধোবাস প্রভৃতি তিন বর্ণের পৃথক্ ব্যবস্থা। কোন্ বর্ণ কিরূপ মেখলা, চর্ম্ম, দণ্ড, উপবীত কিরূপে ধারণ করিবে; কে কিরূপে কি বলিয়া ভিক্ষা করিবে? কে কিরূপে কোন্ অঙ্গুষ্ঠে কোন্ তীর্থে আচমন করিবে; কিরূপে ভোজন করিবে; গুরু কর্ত্তৃক শিষ্যকে কিরূপ শৌচাদি ক্রিয়া শিক্ষা দেওয়া হইবে; অধ্যয়নাদি কিরূপে সম্পন্ন করাইবেন; শিষ্য কিরূপ আচরণ করিবে; কিরূপে সমাবর্ত্তন অর্থাৎ পিতৃকুলে প্রত্যাবর্ত্তন কাল পর্য্যন্ত গুরু-কুলে অবস্থান করিবে; কিরূপে হোম-কাষ্ঠ ভিক্ষান্নাদি আহরণ ও অধোশয্যায় শয়নাদি হীনতা স্বীকার করিবে; ইত্যাদি শত শত বিষয়ের যেরূপ বাহুল্য ব্যবস্থা ছিল, এখন তাহার অনেক পরিবর্ত্তন হইয়াছে। এমন কি, কোনো কোনো বিষয় একবারেই আর দেখা যায় না—স্নাতক ব্রাহ্মণ এখন আর নাই।

যাহার সমাবর্ত্তন অতি সত্বর সম্পাদিত হয়, তাহাকেই স্নাতক আখ্যা দেওয়া হইত। শিষ্য ঐ আখ্যা পাইবার পূর্ব্বে ব্রহ্মচারী থাকেন। ইত্যগ্রে যে সকল আচরণের ইঙ্গিত করা গেল, তদ্ব্যতীত ব্রহ্মচারীকে এই সকলও করিতে হইত যথা;—

মনু। বর্জ্জয়েন্মধুমাংসঞ্চ গন্ধং মাল্যং রসান্ স্ত্রিয়ঃ।
শুক্তানি যানি সর্ব্বাণি প্রাণিনাঞ্চৈব হিংসনং॥ ১৭৭॥

অর্থাৎ মধু, মাংস, কর্পূর, চন্দনাদি গন্ধদ্রব্য, মাল্য ধারণ, গুড়, স্ত্রীসংসর্গ

ত্যাগ করিবে। স্বাভাবিক মধুর দ্রব্য কারণ বশে অম্ল হইয়া শুক্ত নাম পায়, তাহাও খাইবে না। এবং প্রাণি হিংসা করিবে না।

অভ্যঙ্গমঞ্জনঞ্চাক্ষ্ণোরুপানচ্ছত্রধারণং।
কামং ক্রোধঞ্চ লোভঞ্চ নর্ত্তনং গীত-বাদনং॥ ১৭৮॥

অর্থাৎ যাহাকে লোকে আভান করিয়া তৈল মাখা বলে, তাহা করিতে পাইবে না; নয়নে অঞ্জন দান, চর্ম্ম-পাদুকা ও ছত্র ব্যবহার করিতেও পাইবে না; বিষয়াভিলাষ, ক্রোধ ও লোভ ত্যাগ করিবে; এবং নৃত্য গীত বাদ্য ও ত্যাগ করিবে। ইত্যাদি বিস্তর বিধি নিষেধ আছে। সকল শুনিলে, যাঁহারা কখনো সে সব ব্যবস্থা পাঠ করেন নাই, তাঁহাদিগকে অবাক্ হইতে হয়! কয়েক বৎসর পূর্ব্বে শুনা যাইত, দিল্লীতে গান শিখিতে গেলে ওস্তাদ্-জীর যেরূপ উপাসনা করিতে হয়, তাহা অসহ্য! কিন্তু আমাদের বহু-পূর্ব্ব-পুরুষেরা যে সব শবসাধনে জ্ঞানোপার্জ্জন করিয়া স্নাতক নাম পাইতেন, তাহার নিকট আধুনিক কালের কোনো কৃচ্ছ্র সাধনকেই কষ্ট সাধন বলা যায় না।

এই কঠোর ব্রত পালনপূর্ব্বক ছত্রিশ বর্ষ ব্যাপিয়া গুরুগৃহে থাকিবার পর স্নাতক ব্রহ্মচারী দারপরিগ্রহণানন্তর গৃহস্থ হইতে পারিতেন!

কৈ? এখন আর কি তাহার অণুমাত্র দৃষ্ট হয়? এখন যাহারা শিক্ষার্থী, তাহারা তদ্রূপ করা দূরে থাকুক, তদ্বিপরীতে বরং এমনি বোধ হয়, যেন শিক্ষা করিয়া শিক্ষককে চরিতার্থ করিলেন—ছাত্রত্ব স্বীকার করিয়া গুরুর প্রতি যেন বিশেষ অনুগ্রহই দেখাইলেন!

এই সকল পূর্ব্বরীতি বর্ণনা করাতে আমার এমন অভিপ্রায় নহে যে, সেই পূর্ব্বরীতি পুনর্ব্বার প্রবর্ত্তিত হউক। পরিবর্ত্তনের ক্রম দেখানোই উদ্দেশ্য। পরিবর্ত্তন-ধর্ম্ম জগতের স্বাভাবিক বৃত্তি। সেই অলংঘ্য প্রকৃতিকে লংঘন করে, কাহার সাধ্য? অনেক ইউরোপীয় ও ইউরোপীয়-জ্ঞানালোক-সম্পন্ন ব্যক্তিরা বলিয়া থাকেন, হিন্দুসমাজ সহস্র সহস্র বৎসরেও অপরিবর্ত্তিতভাবে চলিয়া আসিতেছে। বস্তুকর্ত্তৃক তাহা নহে। যাহা বলা গেল তাহা এবং বক্ষ্য-মান অন্যান্য বিষয়েও এইরূপ পরিবর্ত্তন দৃষ্ট হইবে। সমাজের আদ্যাবস্থার ব্যবস্থা পরবর্ত্তী কালে অবশ্যই অবস্থান্তর প্রাপ্ত হইবে। তাহাতে এখন তো

বিপুল পরিবর্ত্তনের যুগ—কোনো কোনো আভ্যন্তরিক প্রক্রিয়া যোগে আপনা হইতেই সকল বিষয়ের রূপান্তর সিদ্ধ হইতেছে। যখন এরূপ অবস্থা, তখন দল বাঁধিয়া পূর্ব্ব সমাজ ছাড়িয়া বলপূর্ব্বক অস্বাভাবিক পরিবর্ত্তনের চেষ্টা পাওয়া কেন? আমি যদি কোনো বস্তু ইচ্ছাপূর্ব্বক আপনাকে দিতে উদ্যত হই, তাহা বল করিয়া আপনার লওয়ার আবশ্যক কি? সে বলের একমাত্র অভিসন্ধি এই হইতে পারে যে, লোকে জানুক এ কাজ আমার যত্নে—আমার দ্বারাই হইয়াছে, আপনা হইতে হয় নাই—কিন্তু সেটী বিষম ভ্রান্তি। কোনো গুরুতর পরিবর্ত্তনের পূর্ব্বে সেই বিষয়ের পূর্ব্ব প্রকরণ গুলি পরিপক্ক না হইলে অকালে বলপূর্ব্বক কিছুই হয় না—কিলিয়ে কাঁঠাল কখনই পাকে না!

যাহাহউক এ কথা এক্ষণে থাকুক। ইচ্ছা আছে "সামাজিক" নামক দ্বিতীয় ভাগে তদালোচনা করা যাইবেক। অধুনা সর্ব্বাপেক্ষা গুরুতর সংস্কার বিবাহের কথা বক্তব্য। তাহার পূর্ব্বাপর অবস্থাও দর্শন করা উচিত।

দ্বিতীয় অধ্যায়।

বিবাহ।

পূর্ব্বকালের অষ্ট প্রকার বিবাহের নাম সকলেই শুনিয়াছেন। তদ্যথা;—

মনু। ব্রাহ্মো দৈবস্তথৈবার্ষঃ প্রাজাপত্যস্তথাসুরঃ।
গান্ধর্ব্বো রাক্ষসশ্চৈব পৈশাচশ্চাষ্ঠমোঽধমং॥ ৩অ, ২১।

ব্রাহ্ম, দৈব, আর্ষ, প্রাজাপাত্য, আসুর, গান্ধর্ব্ব, রাক্ষস ও সর্ব্বাধম পৈশাচ, এই আট প্রকার বিবাহ।

আচ্ছাদ্য চার্চ্চয়িত্বা চ শ্রুতশীলবতে স্বয়ং।
আহুয় দানং কন্যায়া ব্রাহ্মোধর্ম্মঃ প্রকীর্ত্তিতঃ॥ ঐ, ২৭।

সবিশেষ বস্ত্রালঙ্কারাদি দ্বারা কন্যা ও বরকে বিভূষিত করিয়া বিদ্যা, সদাচার সম্পন্ন অপ্রার্থক বরকে কন্যাদান করা ব্রাহ্ম।

যজ্ঞেতু বিততে সম্যগৃত্বিজে কর্ম্ম কুর্ব্বতে।
অলঙ্কৃত্য সুতাদানং দৈবং ধর্ম্মং প্রচক্ষতে॥ ঐ, ২৮।

অতি বিস্তৃত জ্যোতিষ্টোমাদি যজ্ঞারম্ভকালে যজ্ঞের পুরোহিতকে সালঙ্কৃতা কন্যা সম্প্রদানকে দৈব বিবাহ বলে।

একং গোমিথুনং দ্বে বা বরাদাদায় ধর্ম্মতঃ।
কন্যা প্রদানং বিধিবদার্ষো ধর্ম্মঃ স উচ্যতে॥ ঐ, ২৯।

যাগাদি সিদ্ধির জন্য (কন্যা বিক্রয়ের মূল্য স্বরূপ নহে) বরের নিকট হইতে এক বা দুই গোমিথুন লইয়া কন্যাদানকে আর্ষ বিবাহ বলে।

সহোভৌচরতাং ধর্ম্মমিতি বাচানুভাষ্য চ।
কন্যা প্রদানমভ্যর্চ্য প্রাজাপত্যো বিধিঃ স্মৃতঃ॥ ঐ ৩০।

তোমরা উভয়ে গার্হস্থ্য ধর্ম্মের আচরণ কর, বর ও কন্যাকে এই বলিয়া অর্চ্চনা পূর্ব্বক বিবাহ দেওয়া প্রাজাপত্য বিবাহ।

জ্ঞাতিভ্যো দ্রবিণং দত্ত্বা কন্যায়ৈ চৈব শক্তিতঃ।
কন্যা প্রদানং স্বাচ্ছন্দ্যাদাসুরো ধর্ম্ম উচ্যতে॥ ঐ ৩১।

কন্যার পিত্রাদি জ্ঞাতিকে বা কন্যাকে শক্ত্যনুসারে শুল্ক দিয়া বরের স্বেচ্ছানুসারে কন্যার পাণিগ্রহণ আসুর বিবাহ।

ইচ্ছয়ান্যোন্যসংযোগঃ কন্যায়াশ্চ বরস্য চ।
গান্ধর্ব্বঃ সতু বিজ্ঞেয়ো মৈথুন্যঃ কামসম্ভবঃ॥ ঐ ৩২।

বর ও কন্যা উভয়ের অনুরাগ-সঞ্চার-জনিত বিবাহকে গান্ধর্ব্ব বিবাহ বলা যায়। এই বিবাহ কামবশতঃ ভোগেচ্ছায় ঘটিয়া থাকে।

হত্বাচ্ছিত্ত্বা চ ভিত্ত্বা চ ক্রোশন্তীং রুদতীং গৃহাৎ।
প্রসহ্যং কন্যাহরণং রাক্ষসো বিধিরুচ্যতে॥ ঐ, ৩৩।

বলপূর্ব্বক হরণ করিয়া বিবাহ করাকে রাক্ষস-বিবাহ বলে। কোনো মতে এ বিবাহে পরেও দান করা যাইতে পারে।

সুপ্তাং মত্তাং প্রমত্তাং বা রহো যত্রোপগচ্ছতি।
স পাপিষ্ঠো বিবাহানাং পৈশাচশ্চাষ্টমোঽধমঃ ॥ ঐ, ৩৪।

নিদ্রাভিভূতা, মদ্যবিহ্বলা অথবা অনবধানযুক্তা রমণীতে নির্জ্জন প্রদেশে গমনের নাম পৈশাচ বিবাহ। ইহা পাপজনক, এই জন্য অধম নামে অভিহিত।

স্বয়ম্বরা হওনের প্রথা ক্ষত্রিয় জাতিতেই শুনা যায়। ফলতঃ এই কয়েক প্রকার বিবাহের মধ্যে অধুনাতন কালে ছয় সাতটী প্রায় উঠিয়া গিয়াছে, দুই এক প্রকার মাত্র প্রচলিত আছে। যথা আসুর বিবাহ। শুল্ক দিয়া পাণি-পীড়নের নাম আসুর এবং আংশিকরূপে প্রাজাপত্য বিবাহ এক্ষণে বিদ্যমান দেখা যায়। যদি বলেন পণ না লইয়া শত শত ঘরে যে বিবাহ হইতেছে, তাহাকে ব্রাহ্মবিবাহ কি বলা যায় না? আমার মতে সম্পূর্ন নয়। কেননা, যদিও ব্রাহ্ম বিবাহের অন্যান্য লক্ষণের সহিত প্রচলিত দান করা বিবাহের ঐক্য আছে, কিন্তু "অপ্রার্থক বরকে" দান করার লক্ষণটী মিলিতেছে না। অনেক স্থলে অপ্রার্থক বর লইয়া বিবাহ দেওয়া হয় বটে, বিশেষতঃ আ'জ্ কা'ল্ বিশ্ব-বিদ্যালয়ের উপাধিধারী সচ্ছাত্ররূপ সৎপাত্রকে বহু উপাসনায় বহু মূল্য দিয়া এক প্রকার ক্রয় করিয়া তোষামোদের সহিত আনিয়া কন্যাদান করা হয় বটে, কিন্তু সে ঘটনা সাধারণ নহে। যাহাহউক, তথাপি আসুর ভিন্ন সর্ব্বাঙ্গ-সুন্দর রূপে অন্যান্য প্রকার পরিণয় অতলস্পর্শ কালসাগরে মগ্ন হইয়া গিয়াছে! কেবল কতিপয় নব্য-সভ্য কর্ত্তৃক মহানাটকের পুনরুদ্ধারের ন্যায় গান্ধর্ব্ব বিবাহটী সেই সিন্ধু-গর্ভ হইতে পুনর্ব্বার উত্তোলনের উদ্যোগ এখন হইতেছে!

সুতরাং প্রায় সকল প্রকার বিবাহই যখন পরিত্যক্ত হইয়াছে, তখন সে কালের বিভাগ এখন আর খাটেনা। এখন নূতন প্রকারের বিভাগ করিয়া বিচার করিতে হয়। বোধ হয়, নিম্ন লিখিত রূপে বিভাজিত হইলে অপ্রযুজ্য হইবে না। যথা;—বহু বিবাহ, তরুণী বিবাহ, বিধবা বিবাহ, অসবর্ণা বিবাহ, গান্ধর্ব্ব বিবাহ, চুক্তিবিবাহ, যুক্তি বা মুক্তি বিবাহ এবং বিবাহ!

এই আটপ্রকার বিবাহ দুই মতে সিদ্ধ। অল্প ভাগ চির-প্রচলিত হিন্দু মতে, তদপেক্ষাও অল্প ভাগ রেজিষ্টরীমতে এবং বেশীর ভাগ নব প্রচলিত ব্রাহ্মমতে।

শাস্ত্রোক্ত আট প্রকার বিবাহ যেমন ব্যাখ্যা করা গিয়াছে, এই অষ্টবিধ উদ্বাহের কোনো কোনোটীর সেইরূপ ব্যাখ্যারও প্রয়োজন হইতেছে।

বহু বিবাহ, বিধবা বিবাহ, অসবর্ণ ও গান্ধর্ব্ব বিবাহের তাৎপর্য্য বেশী বলিতে হইবে না। অবশিষ্ট তিনটীর অর্থ পরিষ্কাররূপে বুঝানো আবশ্যক।

১ম, চুক্তি বিবাহ। চুক্তি বিবাহ তাহাকেই বলে, যাহাতে ধর্ম্মের কোনো সংশ্রব নাই। ধর্ম্ম-বিবাহের মতে পতি পরম গুরু, পতি বৈ অবলার গতি নাই, পতি-ভক্তি ঐহিক পারত্রিকের এক মাত্র মঙ্গলের নিদান, পতি অহিতাচারী ও অপ্রিয়বাদী হইলেও পত্নীকে হিতকারিণী ও প্রিয়বাদিনী হইতে হইবে, অন্যথা ঘোর নরক অবশ্যম্ভাবী। ও পক্ষে আবার ধর্ম্মের দ্বারে—ঈশ্বরের নিকটে পবিত্র প্রতিজ্ঞায় বদ্ধ হইয়া যে পত্নীকে পতি চির-জীবনের জন্য গ্রহণ করেন, তিনি যদি তাহাকে যথাসাধ্য রক্ষণাবেক্ষণ, প্রতিপালন, যত্ন ও স্নেহ করিতে; সম্ভবমত সুখিনী ও প্রকৃতরূপে সহধর্ম্মিণী ভাবিতে এবং তাহার ইহপরকালের কল্যাণব্রতে ব্রতী হইতে ক্রটী করেন, তবে তাঁহারও ঘোর পাপ ও তৎ-ফল-রূপ নরক-গমন অবশ্যম্ভাবী। এরূপ দম্পতীর মতে সর্ব্বপাতা পরম পিতা অথবা প্রজাপতির নির্ব্বন্ধে বা আজ্ঞাতে আমরা সংবদ্ধ, আমরণ এবং মরণের পরেও আমাদের ছাড়াছাড়ি নাই। আমাদের পরস্পরের সুখ দুঃখ, পাপ পুণ্য পরস্পরের প্রতি নির্ভর করে। ইত্যাকার ধর্ম্ম-মূলক সংস্কার যে বিবাহে নাই, তাহাকেই চুক্তি-বিবাহ বলে।

বাণিজ্য কার্য্যে যে প্রণালীতে ও যে ভাবে দেনা পাওনা ও ক্রয় বিক্রয়ের চুক্তিনামা অথবা স্বীকৃতি-নামায় লোকে বদ্ধ হয়, সেইরূপ প্রণয়ের আদান প্রদান, সুখের বিনিময় এবং কর্ত্তব্যের ক্রয় বিক্রয় জন্য স্ত্রীপুরুষে বিবাহ নামা অঙ্গীকার-সূত্রে পরস্পর আবদ্ধ হইলে তাহাকেই "চুক্তি-বিবাহ" বলে। দর্পণে মুখদেখা—তুমি ভাল বাসিবে, আমিও বাসিব; তুমি ভাল বলিবে, আমিও বলিব; তুমি ভাল করিবে, আমিও করিব; তুমি ভালরূপে চলিবে, আমিও চলিব; তুমি প্রেম ও প্রতিপালন রূপ মূল্য দিবে, আমিও প্রেম ও সহবাস রূপ দ্রব্য বিক্রয় করিব। তুমি সেই মূল্য দিতে যখন না পারিবে, আমি চুক্তিপত্রের নিয়মমতে খালাস পাইয়া অন্যের সহিত চুক্তি-নামা অথবা যদৃচ্ছা

গমন করিব! তাহাতে ঈশ্বরের নিকট অপরাধী হইতে হইবে, কি তাহাতে কোনো কলুষ জন্মিবে, এমন বোধ থাকে না; তাহাকেই চুক্তি-বিবাহ বলে।

২য়, যুক্তি বিবাহ। বারাঙ্গনাদি কুলটার সহিত প্রণয় সংঘটন হইল। বিবাহার্থী পুরুষ মনে মনে যুক্তি করিল "জগতে পাপী নয় কে? আমি পাপী, এ রমণীও পাপিনী। পূর্ব্বে যে কারণে হউক পাপাচরণ করিয়াছে, এখন তো আমা বৈ জানে না। আমিও ইহা ভিন্ন জানি না। তবে কেন ইহার সহিত অসামাজিক সম্বন্ধ রাখি? ইহাকে বিবাহ করাই কর্ত্তব্য!" যে চিন্তা, সেই কাজ! তৎক্ষণাৎ একখানি দ্বিতীয় শ্রেণীর ঘোটক-যান আনাইয়া বর ক'নে রেজিষ্টরি আফিসে উপস্থিত! ব্যবস্থাপক সভার কল্যাণ হ'ক্! যে আইন বিধি বদ্ধ কবিয়াছেন, তাহাতো পতিতপাবন—উপপতি উপপত্নী শব্দটী অভিধান হইতে উঠাইয়া দিবার সূত্রধর! রেজিষ্টরী হইল তো পরম পবিত্র উদ্বাহ-সংস্কারও হইয়া গেল! বর, বধূ লইয়া বাটী আইল। পিতা ভ্রাতা আত্মীয়জন মহা বিপদে পড়িলেন! হয়তো তাঁহাদের সেই বউমাকে তাঁহারা পূর্ব্বে কোনো অসাধু সঙ্গে দেখিয়া থাকিবেন—হয়তো নিজ বাটীতেই নর্ত্তকী দলের সঙ্গে নাচিতেই দেখিয়া থাকিবেন—আ'জ্ কি বলিয়া পুত্রবধূ রূপে গ্রহণ করেন? কিন্তু উপায়ই বা কি? আইনমতে ছেলে বিবাহ করিয়াছে, রেজিষ্টরী হইয়াছে! ওদিগে হিন্দু-ধর্ম্মমতে পতিত সন্তানেরাও বিষয় পাইতেছে, কি করেন? বকা ঝকা করিয়া কর্ত্তা রাগ করিয়া কিয়ৎক্ষণের জন্য বাটীর বাহিরে গেলেন! ছেলে বউ লইয়া বিকালে গড়ের মাঠে বেড়াতে গেল! এই বিবাহকে "যুক্তি" বা "মুক্তি বিবাহও" বলা যায়! কেননা যুক্তি বলে পাপেব জীবন হইতে অবলার মুক্তি সাধন যে বিবাহে হইল, তাহাকে "মুক্তি-বিবাহ" বলাতে কোনো মতেই অযুক্তি হইতে পারে না! *

---

* বাঙ্গালা ১২৮১ সালে কোনো সুবর্ণবণিক কুলধ্বজ এইরূপ এক কীর্ত্তি করিয়াছেন। তিনি সমাজ-শোধক নব্য সভ্যদলের পথ প্রদর্শক হইয়া গোলাপ নাম্নী বঙ্গনাট্যালয়ের জনৈক রঙ্গময়ী বেশ্যা অভিনেত্রীর সহিত ঐ রেজিষ্টরি-মূলক আইনানুসারে শুভ পরিণয়-সূত্রে শুভ সম্বদ্ধ হইয়াছেন।

তদুপলক্ষে মধ্যস্থ পত্রে শ্লেষাত্মক যে গানটী প্রকটিত হইয়াছিল, তাহা যদিও বক্তৃতা মধ্যে ছিল না, কিন্তু এই দ্বিতীয় মুদ্রাঙ্কণ কালে তাহার সংশোধিত পাঠ "মনোমোহন-গীতাবলী" পুস্তক হইতে নিম্নে উদ্ধৃত না করিয়া

এক্ষণে যে বিবাহকে "বিবাহ" বলা গেল তাহার ব্যাখ্যা বাকী। তাহা আর কিছুই না, আমাদের চির-প্রচলিত সাদা সিদে বিবাহ। "বাল্য বিবাহ"

থাকিতে পারিলাম না। গানটী নগরসঙ্কীর্ত্তনের সুরে এবং "আ'জ্ বৃন্দাবনে, কে এক সন্নাসী এসে, ভ্রমে রাধা কুণ্ডে'' ইত্যাদি গানের অনুকরণে রচিত।

আ'জ্ বঙ্গদেশে, কে এক যুবতী এসে, ভ্রমে সতী বেশে, উন্নতি উন্নতি
মুখে ঘোষে, রঙ্গভূমে রঙ্গে নাচে হাসে!
আহা মরি! কি আশ্চর্য্য হাব্, চাতুর্য্য ভাব্ হেরি!
যুবজন-মন মোহিতে গো, এ মহীতে নাই হেন নারী!
হেন জ্ঞান হয়্, সামান্যা নয়্, ভূতলে উদয়্, বুঝি গো—
নারী রূপ ধরি, স্বর্গ-বিদ্যাধরী, উর্ব্বসী সুন্দরী! কলির্ পুরুরবা পতি আশে!১।
আছে সঙ্গে ক জন্ ভক্ত গো বঙ্গবাবু গণ্!
মাখি পদরেণু, ভাবে ভোর্ তনু!—তাদের্ সহায়্ নিজে ফুলতনু!—
এই কুল্-নাশা-ফুল্ ফুটাবার্ মূল্ সেই ফুল্ধনু!
ভক্তি-ভরে, নাম্ করে—প্রেম্সে কহ গোলাপ্ ধন্!
সদা সুধাপানে মাতোয়ারা! প্রেমের্ মধু পানে দিশে হারা!
তারা নিজে যেমন্, তাদের্ দেবী তেমন্!
লোক্-মুখে শ্রুত, এক অদ্ভুত, দেয়্ তায়্ গায়্ কাঁটা!
যারা সঙ্গে আছে, তারা ব'ল্ছে সেই পতিব্রতার্ কাছে—
দেবি! দেখ গো, এই সেই লীলার্ স্থান্ শ্রীগরাণ্হাটা!
বসিতে নাগরদলে—যোগিনী-চক্র যামিনী কালে!
যত নব্য সভ্য মেলি, পাত্রে সুধা ঢালি, চন্দ্রমুখে দিয়ে খেতো প্রসাদ্ হ'লে!
সতিগো! বারবধূ যবে ছিলে গো—শত-পতি-বধূ যবে ছিলে গো!
আবার্ যশ, কীর্ত্তি, মান্, যথায়্ দীপ্তিমান্; তোমার্ ঐ সেই নাচিবার্ স্থান গো!
বঙ্গ-রঙ্গালয়ে, যত নব্য কাব্য-গব্যকার্ ল'য়ে!
ঐ সেই মধুর্ গ্রিন্ রূম্—যথায়্ পতিনিধি বিধি মিলিয়ে দিলে!
সেই মধুর্ ধাম্, মধুর্ নটী নাম্, বঁধুর্ তরে যথা সমাধান্! (ক'ল্লে´!)
অনুতাপ করি, জন্ম পরিহরি, হ'লে সতীশ্বরী, এভাব্ ধরি গো!
বণিক-সুবর্ণ, তোমার্ প্রেম্ জন্য, হ'য়ে গণ্য মান্য, পিতৃপুণ্য ধন্য প্রকাশে!

বলিয়া যে বিবাহের নামকরণ আছে, এ বিবাহ তাহাও হইতে পারে। বাল্য-বিবাহ বলুন, হিন্দু-বিবাহ বলুন, আর শুদ্ধ বিবাহই বলুন, এই বিবাহতেই হিন্দু সমাজ চলিয়া আসিতেছে। তরুণী-বিবাহ বলিয়া যে একটী নূতন নাম ইতিপূর্ব্বে বলা গিয়াছে, তাহাই ইহার প্রতিদ্বন্দ্বী। অনেক কুলীনের ঘরে এই তরুণী-বিবাহ মাঝে মাঝে হইয়া থাকে, কিন্তু তাহা সাধারণ প্রথা নহে।

অধুনা সেইরূপ বিবাহ প্রচলন জন্য চতুর্দ্দিকে চেষ্টা হইতেছে। বাল্য-বিবাহের ভূরি ভূরি দোষ প্রদর্শন পূর্ব্বক তরুণী-বিবাহের পক্ষ সমর্থনে এক্ষণে শিক্ষিত যুবক মাত্রেই প্রস্তুত। বাল্য বিবাহের যে সব দোষ তাঁহারা বলেন, তাহার বহুলাংশই বহু লোকের মতে যুক্তি-মূলক বটে। কিন্তু বালিকার বাল্যকাল কত দিন পর্য্যন্ত; বালিকা বয়সের সীমা কি; তাহা নিরূপণ করিয়া প্রায় কেহই বলেন না। একজন ইংলণ্ডীয় প্রসিদ্ধ প্রাকৃত-ইতিবৃত্তলেখক বহু সন্ধানে প্রমাণ প্রয়োগ পূর্ব্বক স্থির করিয়াছেন, উষ্ণ-প্রধান দেশে নয় বর্ষের পর একাদশ বর্ষের মধ্যেই সচরাচর স্ত্রীজাতির যৌবনদশা উপস্থিত হয়। সাহেবের সিদ্ধান্ত বলিলে অনেকের ভক্তি হইবে, এই জন্য বলিলাম; নচেৎ আমাদের মধ্যে কে না চাক্ষুষ করিতেছেন, কোনো কোনো বালিকা নবম দশম বর্ষেই বয়ঃসন্ধি প্রাপ্তা বা যৌবন-সোপানে আরূঢ়া হইয়া থাকে? একাদশ অন্ততঃ দ্বাদশ ত্রয়োদশ বর্ষীয়া বালিকারা সচরাচর পুত্রবতী হইতেছে। ইহার প্রমাণার্থ দূরে যাইতে হইবে না, হয় তো এই সভাস্থলে এমন মহাশয় অনেকেই আছেন, যাঁহারা তদ্রূপ পুত্রের পিতা! মনে মনে হয় তো তাঁহাদের এমন আগ্রহ হইতেছে যে, এখনি উঠিয়া বুকে হাত দিয়া বলেন যে, "হ্যাঁগো, আমি এই ঘটনার ভুক্তভোগী সাক্ষী!" কিন্তু ইংরাজী শিখিয়া আমাদের কেমন একটা দোষ জন্মিয়াছে, আপন চক্ষে কিছুই দেখিব না—আপন কর্ণে কিছুই শুনিব না—আপন বুদ্ধে কিছুই বিচার করিব না! বিশেষতঃ সামাজিক বিষয়ে আট্‌লাণ্টিক মহাসাগরকূলে যাহা লিখিত হয়, যাহা দৃষ্ট হয়, যাহা বিচারিত হয়, তাহাই লেখা, তাহাই দেখা, তাহাই বিচার, তাহাই বেদ, তাহাই ব্রহ্ম! সে দেশের মীমাংসা যে সেই দেশের অবস্থানুসারে হইয়া থাকে, সে মীমাংসা যে সকল দেশে, সকল বিষয়ে খাটে না, তাহা আমরা

ঠাহর করিয়া দেখি না! তাহা আমরা যদি মুখের কথাতেও দুই একবার বলি, কিন্তু উন্নতির কাজে উন্মত্ত হইয়া কাজের বেলা ভুলিয়া যাই!

এস্থলে গ্রীস দেশের মহাজ্ঞানী সক্রেটীসের একটী ক্ষুদ্র উপাখ্যান মনে পড়িল। তিনি যে সময় এথেন্স নগরে অবতীর্ণ হন, তখন তাঁহার জন্মভূমিতে কুতার্কিক দলের অত্যন্ত প্রাদুর্ভাব। সেই কুতার্কিক উপদেষ্টাবর্গের তর্কশক্তি সামান্য ছিল না। তাহারা আশ্চর্য্য তার্কিকতাবলে দিনকে রা'ত্, রা'ত্কে দিন, মনুষ্যকে পশু, পশুকে মনুষ্য বলিয়া সিদ্ধান্ত করিয়া দিত। সক্রেটীস স্বীয় অসাধারণ সত্য-প্রকাশক ক্ষমতা গুণে তাহাদিগের কুযুক্তি ও মিথ্যা মীমাংসক তর্কপ্রণালীকে স্বীয় আশ্চর্য্য যুক্তি-প্রণালীতে খণ্ড খণ্ড রূপে ছেদন করিতে লাগিলেন। তাঁহার জন্য তাহাদের অযশস্কর ব্যবসায়ের হানি হইতে লাগিল। কাজে কাজেই তাঁহার প্রতি তাহারা বিরূপ ও প্রতিশোধের উপায়াবলম্বী হইয়া উঠিল। একদা ঐরূপ একজন কুতার্কিক তাঁহার নিকটে আসিয়া তাঁহাকে ঠকাইবার জন্য বলিল;—"আচ্ছা সক্রেটীস! তুমি কেমন বিজ্ঞ, বল দেখি পৃথিবীতে উত্তম বস্তু কি?"

সক্রে। "তুমি কি স্বাস্থ্যের জন্য কি উত্তম জিজ্ঞাসা ক'চ্ছো?"

তার্কি। 'না'—

সক্রে। "তবে পীড়ার সময় কি উত্তম?"

তার্কি। 'না'—

সক্রেটীস এই রূপ যে কয়েটী বিষয়ের নামোল্লেখ করিলেন, ঐ কুতার্কিক সে সমুদায়ের উত্তরেই "না" শব্দ ব্যবহার করিল। তখন সক্রেটীস বলিলেন, "তবে তুমি সেই উত্তমের কথা প্রশ্ন করিয়াছ, যাহা কোনো কিছুরি পক্ষেই উত্তম নয়!" কুতার্কিক বলিল "সে কি? আমি জানিতে চাই সর্ব্বাপেক্ষা উত্তম পদার্থ কি?" সক্রেটীস বলিলেন, "এমন বস্তু নাই!"

উত্তর। কেন?

প্রত্যুত্তরে সক্রেটীস বুঝাইলেন, "নিরবচ্ছিন্ন উত্তম বা নিরবচ্ছিন্ন অধম এমন কিছুই জগতে নাই। সময়, অবস্থা ও স্থল-ভেদে এক বস্তুই কখনো উত্তম কখনো অধম হইয়া থাকে। ক্ষুধার সময় যে অন্ন অমৃত, অক্ষুধায় তাহা বিষ। রোগ বিশেষে যে বিষ প্রাণদাতা হয়, সুস্থাবস্থায় তাহাই প্রাণনাশক

হইতেছে। এক ব্যক্তিতে যে দান পরম উপকারী, অন্য ব্যক্তিতে সেই দান অপকারী হয়। এক দেশে যে নিয়ম, যে আচার, যে রীতি অপরিহার্য্য ও শুভকরী, অন্যত্র তাহাই অপ্রযুজ্য ও অশুভকরী, সুতরাং ত্যজ্য। ইত্যাদি।"

তখন তার্কিক কহিল, "আচ্ছা বলদেখি, জগতে অত্যন্ত সুন্দর কি?" সক্রেটীস পূর্ব্ব প্রণালী ক্রমে বুঝাইয়া দিলেন, এমন বস্তুও নাই। এক পদার্থ এক সময়ে এক স্থলে পরম সুন্দর, কিন্তু অন্য কালাদিতে অতি কুৎসিত। যে অঙ্গভঙ্গী নৃত্যকালে সুন্দর দেখায়, গমন বা উপবেশন কালে তাহাই অতি কদর্য্য হইবে। মণিমাণিক্য-খচিত বেশ ভূষা যাহার জন্য প্রস্তুত, তাহার অঙ্গে যদি ঠিক না খাটে অর্থাৎ ঢিলা বা কষা হয়, তবে তাহাও কুৎসিত। আর সামান্য বস্ত্রের পরিচ্ছদ যদি বেশকারীর অঙ্গে ঠিক খাটে, তাহাও পরিপাটী হয়। অতএব সর্ব্বস্থলে, সর্ব্বকালে ও সর্ব্ব-পাত্রেই যে এক বস্তু উত্তম ও সুন্দর হইবে, তাহা নহে। যে বস্তু যে উদ্দেশে সৃষ্ট, তাহার তাহাতে সুনিয়োগ হইলেই সুন্দর বল, উত্তম বল, উপকারী বল, সব হইতে পারে। অন্যথা হিতে বিপরীত ঘটিবার সম্ভাবনা।

আমাদের শিক্ষিত যুবকবৃন্দ এই অনুপম নীতিসারময় মহদ্বাক্যটী পদে পদে ভুলিয়া যান। তাঁহাদের শিক্ষাগুরুর দেশ শীতপ্রধান, তাঁহাদের নিজের দেশ উষ্ণ। তত্রত্য মাটির গুণে আর আবহাওয়ার গুণে স্ত্রীলোক কুড়ির কোটায় পা না দিলে যোগ্যা হয় না, এখানকার মহিলারা তত দিনে পাঁচ ছেলের মা! সে দেশের বিবাহকাল ঐকারণে বিলম্বে ব্যবস্থাপিত। এদেশের বিবাহ-কাল ঐকারণে সত্বরে আগত হয়। কিন্তু তাহা না ভাবিয়া, সে দেশে যে বয়সে বিবাহ হইয়া থাকে, আধুনিক সমাজ-সংস্কারকগণ এদেশে সেই বয়স পর্য্যন্ত অপেক্ষা করিতে প্রস্তুত! একজনের একটী খাসা বাড়ী আর একজন দেখিয়া স্বীয় কুটীরে আসিয়া তাহার সাধ হইল, আমিও ঐরূপ বাড়ী করিব। কিন্তু দৃষ্ট পুরী যে স্থলে নির্ম্মিত, তাহার আয়তন অযুত হস্ত; দর্শকের ভিটায় দশহস্ত ভূমি মাত্র আছে। দৃষ্ট পুরীর দক্ষিণে নদী; দর্শকের কুটীরের দক্ষিণে (অন্যের, নিজেরও নয়) বাঁশবাগান ও বন। দৃষ্ট পুরীর অধিকারী ভূস্বামী ও লক্ষপতি; দর্শকের ভূসম্পত্তির মধ্যে ঐ বাস্তুটুকু, আয়ের মধ্যে ৫।৭ টাকা বেতন! এক্ষণে বিবেচ্য এই, সেই দর্শকের সেই সাধ কি শোভা পায়? সে উন্নতির চেষ্টা কি

সঙ্গত? সে চিন্তা কি স্বাভাবিক? না, এই কথা শুনিতে পাইলে তাহার আত্মীয় জনেরা তাড়াতাড়ি কবিরাজের বাড়ী হইতে বিষ্ণু তৈল আনাইয়া তৎক্ষণাৎ তাহাকে মাখাইতে থাকে! আমাদের সমাজ-হিতৈষী অনেক তরুণের অনেক বিষয়ের সাধও সেই প্রকার! অতএব তাঁহাদের আত্মীয় জনের উচিত হয়, অচিরাৎ প্রতীকারের কোনো উপায় অবলম্বন করা!

উপরে যে সকল কথা বলা গেল, তাহাতে এমন বুঝাইতে পারে, যেন সে দেশের ব্যবস্থাপিত বিবাহ কালকে স্বভাবানুযায়ী ও দোষশূন্য বলা হইতেছে এবং এদেশের একাদশ দ্বাদশ বর্ষে সন্তান হওয়ার অবস্থাকেও উত্তম বলা যাইতেছে। আমার অভিপ্রায় কিন্তু তাহা নহে। যাঁহারা সে দেশের রীতির স্তুতিবাদক, তাঁহাদিগের প্রবোধের জন্যই বলা হইল যে, যদিও তাঁহাদের বাক্য-প্রমাণে সে দেশের বিবাহকাল সে দেশের পক্ষে উপযুক্ত হয়, তথাপি এদেশে তদনুকরণ সঙ্গত হইতে পারে না। এবং যদিও একাদশ কি দ্বাদশ বর্ষে সন্তান হওয়া ভাল নয়, কিন্তু তা বলিয়া সে দেশের ন্যায় তত বেশী বয়সে বিবাহ দেওয়াও যুক্তিসঙ্গত বলিতে পারি না। ইহা বুঝাইবার পর সে দেশের প্রচলিত নিয়মে সে দেশেই অনিষ্ট কি ইষ্ট ঘটিতেছে, এক্ষণে তদ্দর্শন কর্ত্তব্য। এইটী দেখা হইলেই, আমাদের দেশের বয়স নির্ণয়ও সহজ হইবে।

আমাদের দেশে যেমন কন্যাপক্ষে বৈবাহিক বয়সের ও সময়ের ঊর্দ্ধসীমা নিরূপিত আছে, ইউরোপে তাহা নাই। অদত্তা কন্যা ঋতুমতী হইলে, পূর্ব্ব পুরুষ নরকগামী হয়, এই শাসন থাকাতে কুলীন ব্রাহ্মণ ভিন্ন অপরাপর হিন্দু শ্রেণী বিশেষ চেষ্টা করিয়া কন্যার তদবস্থা সংঘটনের পূর্ব্বেই তাহাকে পাত্রস্থা করেন। ইউরোপে ইহার বিপরীত নিয়ম—ঊর্দ্ধসীমা নাই, বরং নিম্ন সীমা স্থির আছে। অর্থাৎ পূর্ব্বোক্ত অবস্থা সংঘটনের পূর্ব্বে বিবাহ দেওয়া অত্যন্ত নিন্দিত বিষয় বলিয়া গণ্য হইয়া থাকে। তাহার উপর আবার গান্ধর্ব্ব বিধান অর্থাৎ নায়ক নায়িকার পূর্ব্বরাগ সঞ্চারিত না হইলে কৌমার অবস্থার প্রায় পরিবর্ত্তন হয় না। সুতরাং বহু বহু কন্যাকে অধিক বয়স পর্য্যন্ত কুমারী থাকিতে হয়। স্বাভাবিক প্রবৃত্তি, প্রকৃতির প্রয়োজন এবং প্রকৃত যুক্তি অনুসারে যে কালে দাম্পত্য-শৃঙ্খলে আবদ্ধ হওয়া উচিত, অনেক কুমারীর সে কাল অতীত হইয়া যায়—পরামর্শের বিরুদ্ধ বিস্তারেই অতীত হইয়া যায়।

তাহার ফলস্বরূপ ভদ্র সমাজে অবক্তব্য গোপনীয় কাণ্ড সকল ঘটিয়া থাকে। তখন উচ্চ ধরণের সভ্যতা, উচ্চ ধরণের শিক্ষা, উচ্চ ধরণের জ্ঞানোপদেশ এবং তাঁহাদের মতে সর্ব্বোচ্চ ক্রিশ্চ্যান ধর্ম্ম, কিছুতেই সেই শোচনীয় পাপের স্রোতকে রোধ করিয়া রাখিতে পারে না! কুৎসিত বিষয়ের বিবরণ করা এবং আক্রমণ ব্যতীত অন্য জাতীয় কুৎসার বিশেষ কাহিনী বলা কর্ত্তব্য নহে, নচেৎ সভ্যজাতির এই সামাজিক দোষ—এই কৌমার্য্যপাপের এত বড় বড় উদাহরণ সংগৃহীত হইতে পারে যে, বহু খণ্ড বৃহৎ গ্রন্থ হইয়া যায়। যতটুকু বলা গেল, তাহাও বলিতাম না, কেবল আমাদের অবোধ ঘরের লোককে বুঝাইবার জন্যই অথবা স্মরণ করিয়া দিবার জন্যই বলিতে বাধিত হইলাম। আমাদের দুর্ভাগ্যবশতঃ আমাদের দেশস্থ অনেক লোক ইউরোপের অবাল্য-বিবাহ-জনিত আভ্যন্তরিক ঘোর অনাচারের বৃত্তান্ত জানিয়াও তদ্দেশের বাহ্যিক সভ্যতা ও বাহ্যিক যুক্তির চাকৃচিক্য শোভা দর্শনে একেবারে মুগ্ধ হইয়া অঙ্গ ঢালিয়া দেন; তাহার অত্যন্ত ঔজ্জ্বল্যে সূর্য্যকাণার ন্যায় স্বদেশের ধর্ম্মমূলক যথার্থ পূর্ব্ব সভ্যতাকে আর দেখিতে পান না!

উপরে যে বাহ্যিক সভ্যতা ও বাহ্যিক যুক্তি বলা গেল, তাহা বলিবার তাৎপর্য্য আছে; তাহা এখনই প্রকাশ পাইবেক। অধিক বয়সে বিবাহ দিবার পক্ষে প্রধান যুক্তি এই কয়টী ;—

১। অপত্যোৎপাদন ও গর্ভ ধারণের শক্তি পরিণত অবস্থা প্রাপ্ত না হইলে, কৌমার অবস্থা ত্যাগ করা কর্ত্তব্য নয়।

২। যাহাদের চির জীবন একাত্মভাবে কালযাপন আবশ্যক, তাহারা পরস্পরের মতি গতি না জানিয়া অচ্ছেদ্য বন্ধনে কিরূপে আবদ্ধ হইতে পারে? কিন্তু তাহা জানা অল্প বয়সে সম্ভব নয়। সুতরাং অল্প বয়সে বিবাহ হওয়া অনুচিত।

৩। ঘর সংসার কিরূপে নির্ব্বাহ হওয়া উচিত; পতি পত্নীর, মাতা পিতার কি কি কর্ত্তব্য; এরূপ জ্ঞানযোগ হওনের পর বিবাহ হইলে ভাল হয়।

এইরূপ যুক্তি অবাল্য-বিবাহের পক্ষ। কিন্তু আমরা বলি, ইহার প্রথমটী ব্যতীত আর দুইটী যুক্তি, যুক্তিই নহে। শারীরিক ধর্ম্ম বিবেচনায় প্রথমটী গ্রাহ্য হইতেছে। সেই দৈহিক বিবেচনাকে অগ্রে রাখিয়া বিবাহের যোগ্য

কাল যদি নির্ণয় করা হয়, তবে কোনো আপত্তিই হইতে পারে না। আর দুইটীকে যে অগ্রাহ্য বলিলাম, তাহার কারণ এই যে, মতি গতি জানা, প্রণয় হওয়া ও হিতাহিত বুঝা ১৩। ১৪ বৎসরের মেয়ের পক্ষে যেমন দুরূহ, ১৭। ১৮ বৎসর বয়স্কার পক্ষেও প্রায় তাই। অপিচ, যেমন মৌখিক বা বাহ্যিক যুক্তিতে মতি গতি জানা, প্রণয় সঞ্চার হওয়া, হিতাহিত বুঝা ইত্যাদি আবশ্যক বলিয়া অধিক বয়সে বিবাহের বৈধতা সমর্থন করা হয়, তেমন ও পক্ষে যে যে দেশে অবাল্য-প্রথা চলিত আছে, সেই সেই দেশে যে সব মন্দ ঘটনা ঘটিতেছে এবং এদেশে, যেখানে অধিক বয়সে নয়, অল্প বয়সের বিবাহ প্রচলিত আছে, তাহাতে যে সব ভাল ঘটনা ঘটিতেছে, তাহা তৌল করিয়া দেখাও কি উচিত নয়?

আমরা হিন্দু, আমরা বাল্যকালাবধি হিন্দু পরিবারে ও হিন্দু সমাজে এই শুনিয়া আসিতেছি, হিন্দু কাব্যাদি গ্রন্থে এই পড়িয়া আসিতেছি এবং উচ্চতম হিন্দু-ধর্ম্ম-শাস্ত্রেও এই উপদেশ পাইয়া আসিতেছি যে, স্ত্রীলোকের সতীত্ব রত্নের ন্যায় যত্নের ধন আর কিছুই নাই—আর কোনো বস্তুই তদপেক্ষা অধিক রক্ষণীয় ও অধিক প্রার্থনীয় নয়। আমরা অর্দ্ধ সভ্য দীন দুঃখী পরাধীন ঘৃণিত হিন্দু, আমাদের পক্ষে ঐ সামান্য ধনটীই পরম ধন—সাত রাজার ধন অমূল্য মাণিক অপেক্ষাও মূল্যবান! আমাদের সতীর তেজের নিকট যমও আসিতে পারে না—আমাদের সতীর শাপে ত্রিভুবন এক নিমিষে দগ্ধ হইতে পারে! আমাদের সতীর মাহাত্ম্য এত! হিন্দুদিগের অসভ্য মনে সতীত্বের নিকটে ইন্দ্রত্ব তুচ্ছ পদার্থ! সেই সতীত্ব রক্ষার জন্য বিষয় বিভব গো মহিষ অশ্ব হস্তী—এমন কি বাঙ্গালী যে চাকরীকে প্রাণাপেক্ষা ভালবাসেন, সে চাকরী পর্য্যন্ত—অধিক কি জ্ঞাতি কুটুম্ব আত্মীয় বন্ধু পুত্র কন্যা দেহ প্রাণ পর্য্যন্তও বিসর্জ্জন করিতে হিন্দুমাত্রেই প্রস্তুত! সুতরাং মৌখিক যুক্তিতে যত বাহ্যিক সুবিধা, যত বাহ্যিক উপকার, যত বাহ্যিক গুণ কেন প্রদর্শিত হউক না—সহস্র প্রণয় নাশের শঙ্কা, সহস্র হিতাহিত জ্ঞানের অভাব কেন শিথান হউক না, কিন্তু যাহাতে সতীত্ব ধর্ম্মের বিঘ্ন হওয়া সম্ভব—সম্ভবই বা বলি কেন, বিলক্ষণ ব্যাঘাত তো রাশি রাশি ঘটিতেছে—যাহাতে সতীত্বের এত বিঘ্ন নিশ্চিত, সে কাজ অন্য কোনো বিবেচনাতেই কর্ত্তব্য বলিয়া স্বীকার্য্য নহে!

অধিকন্তু পুথিগত মৌখিক যুক্তি যদি কিঞ্চিৎ কালের জন্য দূরে রাখ এবং সংসারের প্রকৃত ঘটনাবলী যদি একবার ধ্যান করিতে সম্মত হও, তবে একটা কথা জিজ্ঞাসা করি। সে কথাটা এই ;—

বল দেখি—সত্য ঠাহর করিয়া বল দেখি, এই বাল্য কালের বিবাহ জন্য, এই পূর্ব্বরাগ-শূন্য বিবাহ জন্য, এই কোর্ট-সিপ-বর্জ্জিত বিবাহ জন্য এদেশে কয়টা সংসারের স্ত্রীপুরুষে অপ্রণয় ঘটিতেছে ? কয় জন রমণী বা কয়জন পুরুষ পতির বা পত্নীর অনুরাগে বঞ্চিত হইয়া মর্ম্মবেদনায় দগ্ধ হইতেছে ? কয়জন বা ছাড়াছাড়ি হইয়া পরস্পরে স্বাতন্ত্র্য অবলম্বন করিতেছে ?

আবার সেই উচ্চ উচ্চ সভ্যদেশের প্রাত্যহিক ঘটনাবলী উত্তম রূপে ঠাহরিয়া দেখ দেখি, সেই অধিক বয়সের বিবাহ জন্য, সেই পূর্ব্বরাগ ও কোর্টসিপজনিত বিবাহ জন্য অধিক সংখ্যক দম্পতি প্রণয়-পদার্থে প্রতারিত হইয়া মর্ম্মবেদনায় দগ্ধ হইতেছে কিনা ? সহস্র সহস্র গৃহস্থের গৃহলক্ষ্মী পরের অঙ্কলক্ষ্মী হইয়া স্ব স্ব গৃহের সর্ব্বনাশ করিতেছে কিনা ? শত শত পিতা ভ্রাতাদি অভিভাবক কুমারী ভগ্নী ও কন্যাদির কলুষপঙ্কে ডুবিয়া নতশিরা হইতেছে কিনা ? "ডাইভোর্স কোর্ট" নামক দাম্পত্য-বিয়োগ-ধর্ম্মাধিকরণের নিষ্পত্তিনথীতে প্রতিদিন ভয়ঙ্কর ভয়ঙ্কর কুলকলঙ্ক অঙ্কিত হইয়া রহিতেছে কিনা ?

মৌখিক আর বাহ্যিক যুক্তিতে কি করিবে ? এইসকল প্রত্যক্ষ প্রমাণের সমক্ষে এমন সকল বিষয়ে বিদ্যালয়ের ছাত্রলিখিত নবশিক্ষিত তর্কশাস্ত্রের যুক্তি পরম্পরা কি দাঁড়াইতে পারে ? যদি বলেন, হিন্দু-সমাজেও কি তদ্রূপ গৃহবিচ্ছেদ, দাম্পত্য মনান্তর এবং ব্যভিচারাদি দোষ নাই ? স্বীকার করি, আছে। স্বীকার করি, ইহা সর্ব্ব দেশে সর্ব্ব সমাজেই আছে। কিন্তু তবে ঠাহর করিয়া দেখিতে বলিলাম কেন ? তবে তৌল করিয়া দেখিতে বলিলাম কেন ? তালিকা নাই যে ঠিক তুলনা করা যাইবে—সে দেশে বরং আছে, এদেশে তো কিছুই নাই যে ঠিক তৌল করা যাইবে। তথাপি মনুষ্যের অনুমান কোথায় যায় ? সে দেশের তালিকা তো দৃষ্ট হইয়া থাকে ; যদিও সে তালিকা ঠিক নয়—যাহা প্রকাশ পায় তদ্ব্যতীত আরও কত আছে—তথাপি যাহা পাওয়া যায়, তাহাই যথেষ্ট। এদেশের বিষয় এদেশের লোকের অজ্ঞাত নয়, সুতরাং একটা স্থূল অনুমান অবশ্যই হইতে পারে। সেই অনুভবশক্তির গুণে অবশ্যই

ইতর বিশেষ প্রতীত হইবে। তদ্রূপ অনুভব করিয়াই দেখুন দেখি, বাল্যবিবাহ আর কোর্টসিপমূলক অবাল্য-বিবাহের ফল কিরূপ দাঁড়ায়? এরূপে তুলনা করিয়া যদি সর্ষপ আর তাল ফল, গোষ্পদ আর সরোবর, পরেশনাথ আর হিমালয়ে যত প্রভেদ, তত প্রভেদ না দেখিতে পান, তবে এইরূপ মত, যাহা আমি ভজনা করিতেছি, তন্মতাবলম্বীদিগকে উন্মাদ বলিতে যোগ্য হয়েন— তবে আপনারা এদেশে অদ্যই কোর্টসিপের প্রথা—গান্ধর্ব্ব-বিবাহের প্রথা প্রচলিত করিতে সম্পূর্ণ যোগ্য হয়েন।

কিন্তু পরিবর্ত্তনভুক্ নবীন সম্প্রদায়ের প্রতি যেমন বলা হইতেছে, ও পক্ষে অর্থাৎ পুরাতনের নিতান্ত ভক্ত পক্ষেও দুই এক কথা বলা উচিত। অত্যন্ত অধিক বয়সে অনুরাগ সঞ্চার দ্বারা স্বাধীন ভাবে বিবাহ কর্ত্তব্য নয় বলিয়া যে পঞ্চমবর্ষীয়া বালিকার পরিণয় সংস্কারই বিধেয়, তাহা কোনোমতেই স্বীকার করা যায় না। তাহা স্বীকার করিলে বাল্য-বিবাহের বিরুদ্ধে কয়েকটী যুক্তির মধ্যে দৈহিক ধর্ম্ম সম্বন্ধীয় আপত্তিকে যে প্রামাণ্য বলিয়াছি, তাহার সামঞ্জস্য রক্ষা কিরূপে হয়? সকল বিচার্য্য বিষয়েরই দুই অন্ত্য এক মধ্য ভাগ আছে। অত্যন্ত অন্ত্য ভাগ প্রায় সকল বিষয়েরি পরিত্যজ্য। মধ্যভাগ গ্রহণ করিলে অনিষ্ট ঘটিবার অল্প সম্ভাবনা। এরূপ মীমাংসা অত্যুগ্র স্বভাবী-দের নিকট অসম্ভব। একপ মীমাংসা তাহাদের নিকট উপহাসাস্পদ হয়। কিন্তু লর্ড হ্যালিফ্যাক্সের চরিত্র বর্ণনায় লর্ড মেকলে যে স্বর্ণাভিপ্রায় ব্যক্ত করিয়া-ছেন, তাহাই তাঁহাদিগের ব্যবহারের প্রকৃত উত্তর বোধে উদ্ধৃত করিতেছি।

* * * "He (Lord Halifax) was the chief of those politicians whom the two great parties contemptuously called Trimmers. Instead of quarelling with this nickname, he assumed it as a title of honor and viudicated with great vivacity, the dignity of the appellation. Every thing good, he said, trims between extremes. The Temperate Zone trims between the climate in which men are roasted and the climate in which they are frozen. The English Church trims between the Anabaptist madness and Papist lethargy. The English constitution trims between Turkish despotism and Polish anarchy. Virtue is

nothing but a just temper between propensities any one of which, if indulged to excess becomes vice. Nay, the perfection of the Supreme Being himself consists in the exact equilibrium of attributes, none of which could preponderate without disturbing the whole moral and physical order of the world."

ইহার অনুবাদের চেষ্টা করিয়া বৃথা কেন ইহার সৌন্দর্য্য নষ্ট করিব? ইহার প্রকৃত অনুবাদ এই যে, বাড়াবাড়ি কিছুই ভাল না, মাঝামাঝি সবই ভাল! দেশ কাল পাত্র বিবেচনায় সকল কার্য্য করিতে হয়। এক্ষণে ● কাল, তাহাতে পরিবর্ত্তন কেহই ধরিয়া রাখিতে পারিবেন না। অতএব পূর্ব্বকালের গৌরীদানের ফলের লোভটী অধুনা ত্যাগ করাই শ্রেয়ঃ। অর্থাৎ নিতান্ত শিশু-মতি পুত্র কন্যার বিবাহ প্রথা উঠাইয়া দেওয়া অবশ্য কর্ত্তব্য। বয়ঃসন্ধি ব্যতীত বিবাহ দিব না, এই সংকল্পটী যেন সকলের মনেই স্থিরতর হয়। ইহা কিছু নূতন পরিবর্ত্তন হইতেছে না। পূর্ব্বকালের ঋষিবাক্যানুসারে যে সব বিধান ছিল, তাহা কালক্রমে সকলই বিপর্য্যস্ত হইয়াছে। মনুর নিয়ম ছিল কন্যার অপেক্ষা বরের বয়স আড়াই বা তিন গুণ বেশী হওয়া উচিত।

ত্রিংশদ্বর্ষোবহেৎ কন্যাং হৃদ্যাং দ্বাদশবার্ষিকীং।
ত্র্যষ্টবর্ষোঽষ্টবর্ষাম্বা ধর্ম্মে সীদতি সত্বরঃ॥ ৯ অ, ৯৪॥

অর্থাৎ ত্রিশ বৎসরের বর, বার বৎসরের কন্যাকে বিবাহ করিবে। চতুর্বিংশতি বর্ষ বয়স্ক পুরুষ অষ্টম বর্ষীয়া কন্যার পাণিপীড়ন করিবে।

এই ব্যবস্থানুসারে বিবাহ হওয়ার প্রথা বহুকাল রহিত হইয়া গিয়াছে—পুনঃ প্রচলন কর্ত্তব্যও নহে। অধুনা সুপাত্রের অভাবেই হউক বা যোত্রের অভাবেই হউক, যদিও ভদ্র ঘরে প্রায় দশ হইতে চৌদ্দ পনের বৎসর বয়সেও কন্যার বিবাহ দেওয়া হইতেছে বটে, কিন্তু অত্যন্ত বালিকা কন্যাকে পাত্রস্থ করা এবং অত্যন্ত বালক পুত্রকে পরিণয় সূত্রে বদ্ধ করা যে অনুচিত, অর্থাৎ প্রাপ্ত-বয়স্ক না হইলে বিবাহ দেওয়া যে অকর্ত্তব্য, এভাবটী এখনো সাধারণ হয় নাই। যাহাতে সেই ভাবটী সকলের হৃদ্বোধ ও তন্নিয়ম অবশ্য-প্রতিপাল্য হইয়া উঠে, তাহার চেষ্টা শিক্ষিত শিষ্ট সমাজ দ্বারা হওয়াই প্রার্থনীয়।

কিন্তু আর না। এক বাল্য-বিবাহ লইয়াই সকল সময় ক্ষেপণ করিলে

চলে কৈ ? বাল্য-বিবাহ ও বহুবিবাহের প্রতিপক্ষে লোকের চিত্তভূমি অনেক দূর কর্ষিত ও বীজধারণের জন্য প্রস্তুত হইয়াছে বলিয়াই তাহাতে যুক্তি-বীজ বপন ও উত্তেজনা-বারি সিঞ্চন করা কর্ত্তব্য। এই জন্যই এত বলা গেল। ইহার মধ্যে আবার বহুবিবাহ বিষয়ে লোকে অধিকতর চক্ষুরুন্মীলনে সমর্থ হইয়াছেন। বিশেষতঃ পূর্ব্ব বঙ্গদেশে ইহার নিবারণ পক্ষে সম্যক্ উদ্যোগ হইতেছে এবং উদ্যোগী মহাশয়েরা বহুলাংশে কৃতকার্য্যও হইয়াছেন। তাহার অসীম দোষের কথা স্বার্থ-পরায়ণ জনকতক লোক ব্যতীত দেশের প্রায় আর সকলেরি মনে বিশেষরূপে প্রতীত হইয়াছে। সুতরাং তদ্বিষয়ে বাহুল্যরূপ বাক্যব্যয়ের প্রয়োজনাভাব। বাল্য-বিবাহের নিগূঢ় অনিষ্টকারিতা-তত্বটী শিক্ষিতগণ ভিন্ন অন্য কাহারো নিকট তত প্রতিভাত হয় নাই এবং যাঁহাদের সে বোধাধিকার হইয়াছে, তাঁহাদের মধ্যে অনেকের পূর্ব্ব প্রদর্শিতরূপ অতিগমনে অত্যন্ত প্রবৃত্তি দেখিয়াই তদুপলক্ষে সংকল্পাতীত বেশী কথা হইয়া উঠিল।

এক্ষণে দেখা উচিত, অদ্যকার বিভাজিত অষ্ট প্রকার বিবাহের মধ্যে কয়টী হইল, কয়টী অবশিষ্ট। চুক্তিবিবাহ ও যুক্তিবিবাহ তো পূর্ব্বেই হইয়া গিয়াছে। বাল্য, তরুণী, গান্ধর্ব্ব ও বহুবিবাহও এক প্রকার সমাধা হইল। এক্ষণে বিধবাবিবাহ ও অসবর্ণবিবাহ, এই দুইটীর কথা কিঞ্চিৎ বলিলেই হয়।

বিধবাবিবাহ।

যে বিধবাবিবাহের পক্ষে বিদ্যাসাগর মহাশয়ের ন্যায় মহারথী যোদ্ধা এবং প্রতিপক্ষে নবদ্বীপ পর্য্যন্ত প্রায় সর্ব্বস্থানীয় বুধমণ্ডলী প্রতি-যোদ্ধা, সে বিষয়ে হস্তক্ষেপ করা আমাদের সাধ্যও নয়—শুভও নয়! পূর্ব্বকালে ইহা প্রচলিত ছিল কিনা, শাস্ত্রে ইহার বৈধতা ব্যবস্থাপিত আছে কিনা, তাহা তন্ন তন্ন রূপে বিচারিত হইয়া গিয়াছে! না পড়িয়াছেন, না শুনিয়াছেন, এমন লোক অতি অল্প। সুতরাং এস্থলে তদুল্লেখ দ্বারা প্রস্তাব বৃদ্ধির প্রয়োজন কি? শাস্ত্র ছাড়িয়া যদি যুক্তি-মার্গ ধরা যায়, তাহাতেও নূতন কথা বলিবার কি আছে? এতদ্বিষয়ক যুক্তি-মার্গে ভ্রমণকারীর দল বিবিধ। আমরা তন্মধ্যে কোনো দলে মিশিব বা নূতন এক দল বাঁধিব, অদ্যাপি সে অবান্তর ভেদে সমর্থ হই নাই। আপনারাই নিগূঢ় বুঝিতে পারি নাই—যথোচিতরূপে প্রবোধিত হই নাই—অন্যকে কি বুঝাইব? কি উপদেশ দিব?

এমতে এক্ষণে যুক্তিমার্গ ত্যাগ করাও কর্ত্তব্য। যুক্তিপথ ত্যাগ করিয়া যদি দয়াবৃত্তির কথা শুনা যায়, তাহা হইলে নির্দ্দোষী নবোঢ়া বালার কমনীয় কোমল মূর্ত্তি চিত্তফলকে উদিত হইয়া, ঘোর চাঞ্চল্য উৎপন্ন ও অপার শোক-সিন্ধুনীরে মগ্ন করিয়া ফেলে; তখন কি শাস্ত্র কি যুক্তি কাহারো কথা আর শুনিতে ইচ্ছা করে না! যাহারা জন্মগ্রহণ করিয়া মনুষ্যজন্মের কিছুই জানিল না, কোনো সাধ আহ্লাদের আস্বাদ গ্রহণে সমর্থা হইল না, জীবিতা থাকিযা জীবিতা কি মৃতা অনুভব করিতে পারিল না, পাঁচ সখীর সহিত সকল বিষয়ে সখ্যতা—সকল বিষয়ে সাম্যতা সত্ত্বেও জীবনের সারভোগে সদৃশা হইতে পারিল না—আপনার প্রাণাধিক সহোদরের শুভ-বিবাহে ও বাটীর কোনো শুভকর্ম্মে হাত দিতে পাইল না—ভ্রাতার আনীত নব বধূকে বরণ করিযা কোলে লইযা ঘরে যাইতে—আহা! স্পর্শ করিতেও পাইল না, এ দুঃখে কি হৃদয় বিদীর্ণ হয না? সকল থাকিতে কিছুই নাই—দুঃখের জীবন—মর্ম্মান্তিক যাতনা-ভারবাহী জীবন কি কচি বয়সে কেবল একাদশী করিতেই রহিল? যিনি শাস্ত্রের পরম ভক্ত, যিনি পুরাতনের পরম ভক্ত, যিনি প্রথার চিরক্রীত দাস, তিনিও এ যন্ত্রণা দেখিয়া—দেখার মতন দেখিয়া, অন্তরে ধ্যান করিয়া দেখিয়া নেত্রনীর নিক্ষেপ না করিয়া থাকিতে পারেন না! এবং তিনিও স্বশ্রেণীস্থ লোককে আমার সহিত যোগ দিয়া এই প্রার্থনা করিতে অগ্রসর হইতে পারেন, যে,—"হে সামাজিক জ্ঞানবৃদ্ধ শাস্ত্ররক্ষক মহাশযগণ! এদুঃখ আর দেখা যায় না! এত কাল তো একথা উঠে নাই; কেহই সেই অবলাগণকে বলে নাই; তাহারাও তখন লেখা পড়া জানিত না—জানিয়া ভাল মন্দ বিচার করিতে শিখে নাই; অন্য পথ যে হইতে পারে, তাহা তখন অণুমাত্রও জানিতে পারে নাই; মৃত পতির পদধ্যানই যে বিধবার একমাত্র পরম ধর্ম্ম—একমাত্র অবশ্য-প্রতিপাল্য কর্ত্তব্য-কর্ম্ম, ইহাই তাহারা শুনিত, শিখিত, জানিত, মানিত—মনে প্রাণে সর্ব্বান্তঃকরণে বিশ্বাস ও সেই বিশ্বাস প্রাণপণে কার্য্যে পরিণত করিয়া সুখী হইত—পবিত্র জীবন কাটাইত; সুতরাং তখন তাহাতে কোনো হানি ছিল না। এখন চতুর্দ্দিকে এই প্রসঙ্গের তরঙ্গ উঠিতেছে, তোমরা বাহিরে বসিয়া কিছুই শুনিতে, কিছুই দেখিতে, কিছুই জানিতে পারিতেছনা, কিন্তু দেখ গিয়ে, তোমাদের অন্তঃপুর মধ্যে—যেখানে

পূর্ব্বে জ্ঞানপবনের গতিরোধ ছিল—এখন সেই অন্তঃপুরে সেই সব তত্ত্ব, সেই সব জ্ঞান, সেই সব সংবাদ পঠিত, শ্রুত, আলোচিত হইতেছে। আর উহির মধ্যে কোনো অভাগিনী অন্য ছলে পাঁচ মেয়ের নিকট হইতে উঠিয়া গিয়া নির্জ্জন গৃহের শয্যার উপর মুখ গুঁজিয়া পড়িয়া শ্রাবণের এক পসলা চক্ষের জল ফেলিয়া হৃদয়-বিদারক উত্তাপের হাতে কঠোর প্রাণটাকে সেদিনকার মত বাঁচাইয়া আইল! অতএব দয়ার্দ্র হও, দয়ার্দ্র হও! উত্থান কর! চেষ্টা কর! অন্ততঃ যদি কোনো মাঝামাঝি রূপ উপায় থাকে, দয়া করিয়া না হয় তাহাই করিয়া দেও! পুত্রবতী প্রৌঢ়ার ভাগ্যে যাহা হউক, নবপ্রসূনবৎ নবোঢ়ার মুক্তি জন্য কোনো উপায় কি হয় না? শাস্ত্র, যুক্তি, দয়া তিনের ঐক্য করিয়া কি কোনো পন্থা আবিষ্কৃত হইতে পারে না? সাধনার অসাধ্য কিছুই নাই, এই প্রাচীন বাক্য সকল সময়েই খাটে, এই হতভাগিনীদের বেলাই কি ব্যর্থ হইবে?

হায়! মানব-প্রকৃতি কি বিরুদ্ধ ধর্ম্মাবলম্বী। যে কথায় কোনো মীমাংসাই করিব না মনের স্থিরতা ছিল, করুণা-নদীর প্রখর স্রোতে সেই মানসদ্রুমকে কোথায় ভাসাইয়া লইয়া তাহার স্থানে ফলহীন প্রার্থনা-পাদপকে আনিয়া কিসে কি ঘটাইয়া দিল!

অসবর্ণ-বিবাহ।

অসবর্ণ বিবাহ প্রসঙ্গ আলোচনার জন্য পূর্ব্বকালের বিধি নিষেধ গুলি অগ্রে দেখা আবশ্যক।

স্নাতক দ্বিজ সমাবর্ত্তনান্তর দারপরিগ্রহ পূর্ব্বক আশ্রমী হইবেন। তদ্ধেতু প্রথমেই সবর্ণা স্ত্রীর শ্রেষ্ঠত্ব বর্ণিত আছে।

মনু। গুরুণানুমতঃ স্নাত্বা সমাবৃত্তো যথাবিধি।
উদ্বহেত দ্বিজো ভার্য্যাং সবর্ণাং লক্ষণান্বিতাং ॥ ৩অ, ৪।

গুরু অনুমতি করিলে পর সমাবর্ত্তনান্তর বিধানানুসারে ব্রতাঙ্গ স্নান সমাপন করিয়া সেই ব্রাহ্মণাদি ত্রিবর্ণ সুলক্ষণাক্রান্ত সবর্ণা স্ত্রী বিবাহ করিবেন।

এই সবর্ণা বিবাহের বিধি দিয়া সবর্ণার মধ্যেও অনেক স্থলে পাণিগ্রহণ নিষেধ করিয়াছেন। অর্শ, রাজযক্ষা, মন্দাগ্নি, অপস্মার, শ্বিত্র অথবা

কুষ্ঠাক্রান্ত প্রভৃতি দোষাশ্রিত কুলের কন্যা; পিঙ্গলকেশী, বিকৃতাঙ্গী, অধিকাঙ্গী, চির-রোগিণী, অল্প মাত্রও লোমহীনা বা অধিক লোমবিশিষ্টা, নিষ্ঠুরভাষিণী, পিঙ্গলনয়না কন্যা; নক্ষত্র, নদী, ম্লেচ্ছ, পর্ব্বত, পক্ষী, সর্প ও দাসাদির নামে যে স্ত্রীর নাম; ইত্যাদি দোষাশ্রিতা কন্যার পাণিগ্রহণে নিষেধ আছে। আধুনিক কালে ইহার কতক মান্য কতক অমান্য হইত। আ'জ্ কা'ল্ অধিকাংশই অগ্রাহ্য হইয়া উঠিতেছে। কিন্তু ইহার অধিকাংশকে গ্রাহ্য করাই উচিত। যদি হিন্দু আচার ব্যবহারের শারীরিক পরিচ্ছেদটী পরে কখনো লিখিত হয়, তবে সেই সময়ে তাহার হেতুবাদাদি বিশেষ করিয়া বলিবার মানস থাকিল।

এইরূপে সবর্ণ-বিবাহকে শ্রেষ্ঠ বলিয়া পরে অসবর্ণ-বিবাহকে নিকৃষ্ট কল্পনা পূর্ব্বক বিধিবদ্ধ করিয়াছেন। যথা—

সবর্ণাগ্রে দ্বিজাতীনাং প্রশস্তা দারকর্ম্মণি।
কামতস্তু প্রবৃত্তানামিমাঃস্যুঃ ক্রমশোবরাঃ॥ ৩ অ, ১২।

ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয় ও বৈশ্যদিগের প্রথম বিবাহে সবর্ণা স্ত্রীই প্রশস্ত। কিন্তু কামবশতঃ বিবাহ করিতে প্রবৃত্ত হইলে পর বচনোক্ত স্ত্রীই প্রশস্ত জানিবে।

শূদ্রৈব ভার্য্যা শূদ্রস্য সা চ স্বা চ বিশঃ স্মৃতে।
তে চ স্বাচৈব রাজ্ঞশ্চ তাশ্চ স্বা চাগ্রজন্মনঃ॥ ঐ, ১৩॥

শূদ্র কেবল শূদ্রাকেই বিবাহ করিবে, বৈশ্য বৈশ্যা ও শূদ্রাকে; ক্ষত্রিয় ক্ষত্রিয়া, বৈশ্যা ও শূদ্রাকে; এবং ব্রাহ্মণ ব্রাহ্মণী, ক্ষত্রিয়া, বৈশ্যা এবং শূদ্রা চারি জাতীয়া স্ত্রীকেই বিবাহ করিতে পারেন।

কিন্তু ব্রাহ্মণ ও ক্ষত্রিয় কর্ত্তৃক শূদ্রাভার্য্যা গ্রহণের বহু বহু দোষ দেখাইয়া গিয়াছেন। ফলতঃ উপরে যেমন অনুলোমক্রমে নিম্ন শ্রেণী হইতে স্ত্রী-গ্রহণের বিধান আছে, তৎপরে বিশেষ নিয়ম দ্বারা ব্রাহ্মণ ও ক্ষত্রিয় পক্ষে শূদ্রাকে গ্রহণ করা কর্ত্তব্য নয়, ইহাই ব্যবস্থাপিত হইয়াছে। বাহুল্য ভয়ে সে সকল বিশেষ বিধি এস্থলে উদ্ধৃত হইল না।

ফলতঃ পূর্ব্বে হিন্দুসমাজে অসবর্ণ বিবাহ যে চলিত ছিল, তাহাতে অণুমাত্র সন্দেহ নাই। শুদ্ধ সংহিতা নয়, রামায়ণ, মহাভারত, পুরাণ, উপপুরাণে

বর্ণিত নানা ইতিহাস তাহার প্রমাণ। কিন্তু সেই অসবর্ণ বিবাহ সীমাবদ্ধ ছিল। যে যাহাকে ইচ্ছা, সে তাহাকে বিবাহ করিয়া যশস্বী হইবে, এমন নিয়ম ছিল না। নিম্ন শ্রেণীর কন্যা বিবাহ করিলে কোনো কথা হইত না, কেবল প্রথম দুই শ্রেণী যদি সর্ব্ব নীচের শ্রেণীতে বিবাহ করিতেন, তবেই দোষের বিষয় হইত।

এরূপ দোষ সুসভ্যতম আধুনিক ইউরোপেও ধর্ত্তব্য হইয়াথাকে। তাঁহারা গর্ব্ব করেন যে হিন্দুদের ন্যায় জাতিভেদ ও সবর্ণ বিবাহের দোষ তাঁহাদিগের মধ্যে নাই। খৃষ্টানধর্ম্মের প্রসাদে তদ্রূপ অনুদার ও অধর্ম্মমূলক দেশাচারে তাঁহারা মুক্ত আছেন এবং সমস্ত মানবকে এক পিতার সন্তান ভাবিয়া পবিত্র সৌভ্রাত্র-রসে পৃথিবীকে ভাসাইয়া দিতেছেন। কিন্তু এ সব মৌখিক কথা, বাহ্যিক যুক্তি ও বাহ্যিক সভ্যতা! তাঁহাদের সমাজের আভ্যন্তরিক ভাগ চিরিয়া দেখিলে এই সমস্ত স্বর্গীয় কথার ব্যবহারগত সম্পূর্ণ অভাব লক্ষিত হইবে। আ'জ্ কা'ল্ ইংলণ্ডই সর্ব্বাপেক্ষা সভ্য, স্বাধীনতা-প্রিয়, উদারতার আধার, এবং আমাদের অনুকরণ স্থল। সেই ইংলণ্ডের মধ্যে লর্ড লেডী উপাধিধারী উচ্চশ্রেণীর লোক অপরাপর শ্রেণীকে বিশেষতঃ নির্ধন শ্রমজীবী ও ক্ষুদ্রব্যবসায়ী প্রভৃতি স্বজাতীয়গণকে যেরূপ হেয়জ্ঞান করিয়া থাকেন, তাহা প্রায় আমাদের দেশের চণ্ডালের প্রতি প্রাতঃস্নাত ব্রাহ্মণের ব্যবহারের সদৃশ! ইহারা অন্য শ্রেণীর বিশেষ ধনী ভিন্ন অন্য কাহাকে লইয়া ভোজন করিতেও চাহেন না—পরিণয়ের কথায় তো খড়্গহস্ত!

যে দেশে বিদ্যার চর্চ্চা অসম্ভবরূপে প্রবল, যে দেশে সভ্যতার ধার এত তীক্ষ্ণ যে ছুঁতে মাছি কাটে, যে দেশের ধর্ম্ম-প্রচারকেরা ও উপদেশকেরা ধর্ম্ম-মন্দিরে, যজমানের মন্দিরে, প্রতিনিধি সভা-মন্দিরে, বাক্যে, সংবাদ পত্রে, গ্রন্থে সৌভ্রাত্র-তত্ত্বের পবিত্র কথা অজস্র গান করিতেছে—আপনাদের জন্ম-ভূমি ছাপাইয়া উঠিয়া সেই উপদেশ-স্রোত ভূমণ্ডলে সর্ব্বত্র বিস্তারিত হইতেছে—অন্য দেশে তাঁহাদের গর্ব্বিত-বাক্য শুনিলে বোধ হয় যেন তাঁহাদের নিজের দেশ হইতে সর্ব্ব দোষরূপ জঞ্জাল ঝাঁটাইয়া ফেলিয়া দেওয়া হইয়াছে—এমন যে ইংলণ্ড দেশ, সে দেশে যখন উচ্চ শ্রেণীর এই ব্যবহার, তখন কুসংস্কারা-বিষ্ট আর্য্য দেশের স্বার্থপরায়ণ ব্রাহ্মণেরা যে এরূপে আপনাদের প্রাধান্য সংস্থা-

পন করিয়া যাইবেন, তাহাতে আশ্চর্য্য কি! সেই সভ্য ইংলণ্ডে সবর্ণ-বিবাহ (মুখে না হউক) কাজে এত প্রবল যে, ভৌতিক তত্ত্বজ্ঞ ও শারীরিক তত্ত্বজ্ঞ জ্ঞানী লোকের প্রমাণ-সিদ্ধ উপদেশকে অবহেলা করিয়াও স্বগোত্রা কন্যা, এমন কি আপনার খুল্লতাত-জ্যেষ্ঠতাত-পুত্রী এবং অতি নিকট-সম্বন্ধীয়া পিতৃ-স্বসা-মাতৃ-স্বসা-পুত্রীকেও তাঁহারা বিবাহ করিয়া থাকেন! ফলতঃ কেবল সহোদরা, বিমাতা ও বৈমাত্র ভগ্নীকে এবং মহাগুরু শয্যাগুরুর ভগ্নীকে মাত্র বাছিয়া থাকেন! * নচেৎ তাঁহাদের অগ্রহীতব্যা রমণী আর কেহই নাই!

এ বিষয়ে বরং হিন্দুশাস্ত্র ও হিন্দুপ্রথা তাঁহাদের আদর্শস্থল হইতে পারে। মনু লিখিয়াছেন—

> অসপিণ্ডা চ যা মাতুরসগোত্রাচ যা পিতুঃ।
> সা প্রশস্তা দ্বিজাতীনাং দারকর্ম্মণি মৈথুনে॥ ৩ অ, ৫।

যে স্ত্রী মাতার সপিণ্ডা না হয় অর্থাৎ সপ্ত পুরুষ পর্য্যন্ত মাতামহাদি বংশ-জাতা না হয় ও মাতামহের চতুর্দ্দশ পুরুষ পর্য্যন্ত সগোত্রা না হয় এবং পিতার সগোত্রা বা সপিণ্ডা না হয় অর্থাৎ পিতৃস্বস্রাদি সন্ততি সম্ভূতা না হয়, এমন স্ত্রীই দ্বিজাতিদিগের বিবাহের যোগ্যা। এই নিয়ম হিন্দু-সমাজে আবহমান সংরক্ষিত হইয়া আসিতেছে। কুলীন ব্রাহ্মণেরা মিলের ঘর না পাওয়াতেই এই শুভকরী ব্যবস্থার যাহা কিছু বিপরীত কাজ করেন—ঠাকুরেরা নাই বা করেন কি—মাতৃস্বসা পর্য্যন্তও প্রায় হইয়া যাইতেছে!—যাহা কিছু দোষাবহ তাহা তাঁহাদিগেরই তেজস্বী ঘরে এবং আ'জ্ কা'ল্ উপযুক্ত পাত্রের অভাবে কোনো কোনো স্থলে অন্যান্য বর্ণ মধ্যেও তন্নিয়মের সামান্যরূপ অঙ্গভঙ্গ হয়, এই মাত্র। নচেৎ এই সুন্দর প্রথাটী হিন্দুসমাজে সাধারণতঃ অদ্যাপি মান্য গণ্য হইয়া আসিতেছে। একালে অসবর্ণ বিবাহ এককালে উঠিয়া গিয়াছে, সেই সঙ্গে এই সু ধারাটী যে উঠিয়া যায় নাই, ইহাকেও পরম ভাগ্য বলিয়া মানিতে হইবেক!

সবর্ণ বিবাহ সম্বন্ধে আর একটী কথা বলিবার আছে। পূর্ব্বকালে অসবর্ণ উদ্বাহ যেমন সীমাবদ্ধ ছিল, সবর্ণ বিবাহ তেমন সঙ্কীর্ণ আয়তনের ছিল

---

* শেষেরটী নিতান্তই অযৌক্তিক—এই জন্যই অনেকে কার্য্যতঃ তাহা মানেন না এবং তদ্বিষয়ক ব্যবস্থা-সংশোধনের চেষ্টা পাইতেছেন।

না। অর্থাৎ অলক্ষণা কন্যা ও কুষ্ঠাদি রোগাক্রান্ত প্রভৃতি দোষাশ্রিত দশবিধ কুল না হইলেই হইল। এই সকল দোষ এক্ষণকার ইউরোপীয় পণ্ডিতগণের মতেও মহদ্দোষরূপে গণ্য ও বিবাহের সম্বন্ধে তদ্দোষাশ্রিত কুলের পুত্র কন্যা সর্ব্ব মতেই সর্ব্বথা পরিত্যাজ্য। তদ্রূপ কুলজাতা কন্যা ব্যতীত আর সকল ব্রাহ্মণের কন্যাকে সকল ব্রাহ্মণ বর, সকল ক্ষত্রিয় কন্যাকে সকল ক্ষত্রিয় বর এবং অন্য বর্ণের সকল কন্যাকেই তজ্জাতীয বর বিবাহ করিতে পারিত। এই মঙ্গলগর্ভ সুন্দর প্রথাটী এক্ষণে নিতান্ত সঙ্কোচিত হইযা উঠিয়াছে। রাঢ়ীয় শ্রেণী, বৈদিক শ্রেণী, বারেন্দ্র শ্রেণী প্রভৃতি বহুবিধ ব্রাহ্মণ শ্রেণী, এবং দক্ষিণ রাঢ়ী, উত্তররাঢ়ী, বঙ্গজ, কটকী, মুদী-কায়েত প্রভৃতি বহুবিধ কাযস্থ শ্রেণী হইয়াছে। তদুপরি শাস্ত্রাসিদ্ধ বল্লালী কৌলিন্য থাক্ হইয়া আরো সর্ব্বনাশ ঘটাইযাছে! পূর্ব্বে যাহারা এক বর্ণ ও এক শ্রেণীরূপে আবদ্ধ ছিল, এখন তাহারা নানা শ্রেণীতে খণ্ড বিখণ্ড ভাবে বিভক্ত এবং ঘোরতর জাত্যাভিমানে মত্ত হইযা পরস্পরের বৈবাহিক সম্বন্ধ উঠাইয়া দিয়াছে। এই বর্ণান্তর্গত শ্রেণী বিভাগ কদাচ ঋষি-কৃত নহে। ইহা শাস্ত্রে নাই, সুতরাং হিন্দুস্থানের কুত্রাপিও নাই; বঙ্গীয সমাজেই আধুনিক কালে প্রবর্ত্তিত হইযাছে। বারেন্দ্র কন্যা, রাঢ়ীয বর; বৈদিক পুত্র, রাঢীয় কন্যা; এরূপ বিবাহ হইলে যে কোনো ধর্ম্মশাস্ত্রের বিরুদ্ধাচরণ হইবে, এমন তো বোধ হয না। সকলেই এক ব্রাহ্মণ বংশ হইতেই সম্ভূত, এমন কোনো কার্য্য কোনো শ্রেণী করেন নাই, যাহাতে সেই শ্রেণী পতিত হইযাছেন। তবে এই ভেদ ঘটিবার প্রধান কারণ বাসস্থান। তখন দেশের এক ভাগ হইতে অন্য অঞ্চলে যাতায়াতের তত সুবিধা ছিল না—রাজপথ বা শান্তিকার্য্যের তত সুশৃঙ্খলা ছিল না, এই জন্যই পরস্পরের ব্যবহার রহিত হওযাই প্রতীতি হইতে পারে। নতুবা শাস্ত্রে যে এরূপ বিবাহের নিষেধ আছে, তাহা তো শুনিতে পাওয়া যায না। স্মার্ত্ত পণ্ডিতকে ইহার ব্যবস্থা জিজ্ঞাসা করিয়া স্বরূপ তত্ত্ব জানিয়া যে আমি বলিতেছি, তাহা নহে। এ কেবল অনুমানে বলা। সনাতন ধর্ম্মরক্ষণী সভার মহিমান্বিত সভাপতি মহাশয় অদ্য আমাদেরও সভাপতি। এ ঘটনা উত্তমই হইয়াছে। তিনি যদি এই অবশ্য-বিচারণীয় প্রস্তাবটী উক্ত সভায বিচার করেন এবং নবদ্বীপ প্রভৃতি সমাজের বুধমণ্ডলীকে উক্ত সভায় ইহার ব্যবস্থা

পাঠাইতে অনুরোধ করেন, তবে একটী মহান্ সামাজিক মঙ্গলের সূত্রপাত হয়। অসবর্ণ বিবাহকে যদি কেহ সহস্রবার এরূপ স্থলে কর্ত্তব্য বলিয়া প্রতিপন্ন করে, তথাপি সাধারণ হিন্দুসমাজে তাহা এক্ষণে প্রচলিত হওনের কোনো প্রত্যাশা দেখা যায় না। কিন্তু সবর্ণ-বিবাহ সর্ব্ব শ্রেণীতেই শাস্ত্রসিদ্ধ, বর্ণান্তর্গত শ্রেণী-বিভাগ জন্য বিবাহ আটক থাকে না, এমন কথা যদি প্রমাণীকৃত হয়, এবং উপরে যে সকল যোগ্য পাত্রের নামোল্লেখ করিলাম, তাঁহারা যদি সর্ব্বান্তঃকরণে সেই প্রথা পুনঃস্থাপনের চেষ্টা করেন, তবে তাহা সমাজের গ্রাহ্য হইয়া আশু ফলোৎপাদক হইতে পারে। তদ্দ্বারা এক এক বর্ণের নানা শ্রেণীর ঐক্য বিধান এবং সবর্ণ বিবাহ পদ্ধতিতে অধুনা যে নৈকট্য ও সঙ্কীর্ণতা দোষ জন্মিয়াছে, তাহার পরিহার হইয়া সমাজের অশেষ কল্যাণ সাধিত হয়। অতএব প্রার্থনা করি, এমন বিষয়ে আর ঔদাস্য করা না হয়—অদ্য রজনী প্রভাতে কল্যই যেন চতুর্দ্দিগে এ প্রস্তাবের আলোচনা শুনা যায়, সনাতন ধর্ম্মরক্ষণী সভা এমন বিধান করুন!

পুনর্ব্বিবাহ।

যে অষ্ট প্রকার বিবাহের কথা বলা গেল, তদ্ব্যতীত একটী উপবিবাহ বা অতি-বিবাহও আছে। তাহার বহু নাম। তাহাকে দ্বিতীয় সংস্কার, দ্বিতীয় বিবাহ, পুনঃসংস্কার, পুনর্ব্বিবাহ, পুষ্পোৎসব, দ্বিতীয় উৎসব এবং মেয়েলি কথায় সূর্য্য-অর্ঘ্যও বলিয়া থাকে। এই জঘন্য সংস্কার কবে যে হিন্দুসমাজে প্রথম প্রবর্ত্তিত হয়, তাহা বলিতে পারি না। কিন্তু ইহার ন্যায় নির্লজ্জ ও ঘৃণাকর উৎসব যে বঙ্গীয় সমাজে দ্বিতীয় নাই, তাহা নিঃসংশয়ে বলা যাইতে পারে।

দেশে জ্ঞানচর্চ্চার যত আধিক্য হইতেছে, তৎফল স্বরূপ অশ্লীল কথোপকথন, অশ্লীল লেখা, অশ্লীল চিত্র, অশ্লীল সঙ্গীতাদি যত উঠিয়া যাইতেছে, ঐ ঘৃণিত কাণ্ড ততই কোথায় হ্রাস পাইবে, না ততই তাহার দিন দিন অঙ্গরাগ হইতেছে। রাজধানীতে বিদ্যার প্রাদুর্ভাব অধিক, রাজধানীর শিক্ষিত যুবকেরা সভ্যতা সভ্যতা করিয়া পাগল, কিন্তু সেই রাজধানীতেই যে ইহার জাঁক জমক বেশী হইতেছে, ইহার অপেক্ষা আশ্চর্য্য আর কি?

আমি দেখিয়াছি, এক প্রতিবাসীর বাটীতে পূর্ব্বে দোল দুর্গোৎসবাদি ক্রিয়া কলাপ বিস্তর হইত। যম দণ্ডে তাহা বন্ধ হইয়া যায়। কয়েকটী

আশার ধন বালক ও একটী অকৃতী কর্ত্তামাত্র অবশিষ্ট। কালে ঐ বালকেরা ইংরাজীতে উত্তমরূপে শিক্ষিত হইয়া বিলক্ষণ উপার্জ্জন-শীল যুবাপুরুষ হইয়া উঠিল। কিন্তু ক্রিয়া কর্ম্ম আর দেখা দিল না। সে বাটীতে কোনো পর্ব্বাহে, কোনো উৎসবে, কোনো কিছুতে, ইচ্ছাভোজেও আর লোকের পাত পড়ে নাই। এমন সময় এক অংশীর একটী মাত্র বংশধরের দ্বিতীয় সংস্কার উপস্থিত। ঘটার সীমা নাই, আয়োজনেরও অন্ত নাই! কলিকাতার বিস্তর বড় বড় ঘরে তাঁহাদের কুটুম্বিতা। উড়িষ্যাদেশীয়ের নর-যান শত শত নিযুক্ত হইল। নিমন্ত্রিতা কুটুম্বিনীগণ অধিষ্ঠিতা হইলেন। তাঁহাদের দাসীর কল্লোলে পাড়ায় সমুদ্র-কল্লোল উত্থিত হইল। পূজার বাটীর বিশাল প্রাঙ্গনে বৃহতী সভা হইল—বাইনাচের মজ্‌লিস্‌—খেম্‌টানাচের মজ্‌লিস্‌—পাঁচালির মজ্‌লিস্‌! তৎপরে যে ভূরি-ভোজ হইল, তাহার ইয়ত্তা করা যায় না! দেখুন, যাহাদের অন্য কর্ম্মে এক কপর্দ্দকও ব্যয় নাই, যাহারা সম্পূর্ণ সুশিক্ষিত, যাহারা বাঙ্গালীর প্রার্থনীয় ভাল ভাল কর্ম্ম করে, যাহারা অন্য সকল বিষয়ে সভ্যাগ্রগণ্য, তাহাদিগের ভবনেই এই, অন্য পরে কা কথা!

পল্লীগ্রামে সচরাচর এত ব্যয়-সাধ্য ঘোর ঘটা না হইলেও যাহা হয়, তাহা ভদ্রলোকের দেখা থা'ক্‌, শুনিলেও কর্ণে হাত দিতে হয়! যে সকল ভদ্র পুরন্ধ্রীগণ স্বভাবতঃ ও দেশাচারসম্মত কোনো বাচালতা ও কিছুমাত্র লজ্জাহীনতা দোষে দোষী নন, তাঁহারাও সে দিন ইতর ঘরের ইতর প্রকৃতির স্ত্রীলোকের সাহচর্য্যে, তাহাদের উত্তেজনায়, তাহাদের দৃষ্টান্তে এমন হইয়া উঠেন, যে, পরক্ষণে তাঁহারা আপনারাই তাহা স্মরণ করিয়া লজ্জায় মরিয়া যান!

অতএব যাহাতে দেশ হইতে এই ঘোর কদাচার মূল সহিত উৎপাটিত হইয়া যায়, এমত উপায় অবলম্বন করা দেশ হিতৈষী মাত্রেরি উচিত। এই সভা এই দোষ নিবারণে যত্নশীল হইলে দেশের একটী প্রকৃত দুরিত দূরীকরণ করা হয়।*

---

* সুখের বিষয় প্রথম মুদ্রাঙ্কণের পর এই প্রবন্ধ পাঠ করিয়া অনেক ভদ্রযুবক তাঁহাদের ভবন হইতে এই কুপ্রথা এককালে উঠাইয়া দিয়াছেন—সে সব পরিবারে ইহার প্রকাশ্য অনুষ্ঠান কিছুমাত্র আর হয় না।

তৃতীয় অধ্যায়।

সংশ্লিষ্ট পরিবার।

আর্য্য নাম যত প্রাচীন, বোধহয় আর্য্য জাতির সংশ্লিষ্ট-পরিবার প্রণালীও তত প্রাচীন। মনুষ্য সমাজের আদ্যাবস্থায় ইহার আবশ্যকীয়তা যত, উন্নত ও সভ্য কালে তত প্রয়োজন থাকে না। যখন বলবানেরই প্রভুত্ব, দুর্ব্বলের দাসত্ব, তখন প্রবলের দৌরাত্ম্য হইতে আত্মরক্ষার্থ আত্মীয় লোকে সকলের একত্র থাকা অপরিহার্য্য রীতি হওয়া স্বাভাবিক। সুদ্ধ তাহা নয়, জ্ঞানের খর্ব্বতাকালে স্বাধীনতার ভাব ও আস্বাদ মনুষ্য-হৃদয়ে অধিক প্রবল হয় না। কাজে কাজেই পিতা মাতা প্রভৃতি গুরুজনের বশে থাকিতে স্বতঃ প্রবৃত্তি হয় এবং তর্কশক্তির কর্ষণাভাবে "আমি বড় বুঝি, উনিও মানুষ, আমিও মানুষ, আমিই বা কুক্কুরবৎ উহাঁর পদলেহন কেন করিব?" ইত্যাকার ভাব হৃদয়ে তখন স্থান পায় না। সুতরাং সংশ্লিষ্ট সম্বন্ধ ক্লিষ্ট হইতে পারে না।

কিন্তু হিন্দুদিগের এ অবস্থার সম্পূর্ণ পরিবর্ত্তনের পরেও—যখন তাহাদিগের সভ্যতা, জ্ঞান, তর্কশক্তি অত্যন্ত প্রবল, তখনো এই ভাবের রূপান্তর হয় নাই। যখন মধ্যম পাণ্ডব ভীমের এক একবারের গদাঘাতে রথ, রথী, হয়, হস্তী, পদাতিক চূর্ণায়মান হইত, যখন তৃতীয় পাণ্ডব গাণ্ডীব-ধন্বার ধনুনির্ঘোষে ত্রিভুবন কম্পিত হইত, তখনো তাঁহাদের মনে যুধিষ্ঠিরের প্রতি "কেনই বা আমরা উঁহার অধীনে থাকিব? আমাদের ভুজ-শাসিত সসাগরা ধরামণ্ডল কেনই বা উনি বসিয়া ভোগ করিবেন?" এরূপ ভাবের কণামাত্র একদিনের জন্যও উদয় হয় নাই! ইহাতেই অনুভব হইতেছে, হিন্দু জাতির স্বাভাবিক দয়া ও আসঙ্গলিপ্সা বৃত্তি অপেক্ষাকৃত সমধিক তেজস্বিনী।

যাহাদের কবিরা নাটকাদি কাব্যে একটীমাত্রও শোক-শেষ আখ্যায়িকা সন্নিবেশ করে নাই, যাহাদের পশু-পক্ষীর প্রাণহিংসাকেও মহাপাপ, তাহাদের দয়ার কথা ব্যাখ্যা করিতে হইবে কেন? সেই দয়া যাহাদের শরীরে থাকে, তাহাদের সামান্য আসঙ্গ লিপ্সা বৃত্তি যে প্রবলা হইবে, আশ্চর্য্য কি? কিন্তু

যে কারণেই হউক, হিন্দুরা যে চিরকাল সংশ্লিষ্ট-ভাবাপন্ন তাহাতে তর্ক উঠিবার সম্ভাবনা নাই।

তৎপ্রতিপক্ষে বা সপক্ষে এতকাল কোনো কথাই উঠে নাই—ভাই ভাইতে মিলিয়া থাকিবে, তাহাতে আবার প্রশংসা কি? তাহাতে আবার দোষের আভাসই বা কি? যাহারা ঐক্য বাক্যে থাকিতে না পারিত, তাহাদের নিন্দা হইত, এখনো হয়। এ প্রস্তাব যে একটী বিচার্য্য বিষয়, ইহার যে আবার প্রতিবাদ পক্ষ আছে, একথা কিছুকাল পূর্ব্বে আমাদের পিতা পিতামহ মহাশয়েরা শুনিতে পাইলে হাসিয়া খুন হইতেন! কালধর্ম্মে হাসির কথাতেও কাঁদিতে হয়! আমরা সেই কাল-শাসনে পতিত হইয়া এই প্রথার দোষগুণ বিচার করিতে আজ্ বাধিত হইতেছি।

দোষগুণ বিচারের পূর্ব্বে দেখা চাই, হিন্দু সংশ্লিষ্ট পরিবার কিরূপ? বাটীতে সমস্ত পরিবারের মধ্যে একজন কর্ত্তা! সম্পর্কে এবং বয়সে যিনি বড়, তিনিই প্রায় কর্ত্তা হইয়া থাকেন। কখনো কখনো বেশী কৃতী, বেশী বুদ্ধিমান, বেশী কার্য্য-কুশল বলিয়া কনিষ্ঠও কর্ত্তা হয়েন। তাহাতে জ্যেষ্ঠকে সন্তুষ্ট বৈ অসন্তুষ্ট হইতে প্রায় দেখা যায় না। সন্তুষ্ট না হইবার বিশেষ কারণ আছে। তিনি জানেন আমাপেক্ষা আমার কনিষ্ঠ ভ্রাতা বা ভ্রাতুষ্পুত্র বা পুত্র উত্তমরূপে পারিবারিক, সামাজিক ও বৈষয়িক ব্যাপার নির্ব্বাহে পটু, তাহার হস্তে ভারার্পণ করিলে ভালই হইবে। বিশেষতঃ ঐ কনিষ্ঠ কর্ত্তৃত্ব করেন বটে, কিন্তু জ্যেষ্ঠের প্রতিনিধি হইয়া, জ্যেষ্ঠের নাম রাখিয়া এবং জ্যেষ্ঠের নামে নিমন্ত্রণাদি সামাজিক এবং সংকল্পাদি ধর্ম্ম-বিষয়ক কর্ত্তব্য সকলি জ্যেষ্ঠের নাম লইয়া করিতে হয়! কনিষ্ঠ কর্ত্তৃত্ব করেন, কিন্তু জ্যেষ্ঠের নাম কর্ত্তা। তিনি কাজে না হইলে নামে কর্ত্তা বটেন। তাঁহার পুত্রের উপার্জ্জনে বাটীতে যদি ক্রিয়া কর্ম্ম চলে, তবে তো তিনি প্রকৃতই কর্ত্তা! একান্নভুক্ত ভ্রাতা বা ভ্রাতুষ্পুত্রের উপার্জ্জনে অথবা পৈত্রিক সম্পত্তির আয়ে হইলেও তিনি কর্ত্তা। পৃথকান্ন ভ্রাতাদির সংসারে সামাজিক বিষয়ে তিনি কর্ত্তা। ঐরূপ স্বসম্পর্কীয় কেহ স্বতন্ত্র বাটীতে বাস করিলেও তিনি কর্ত্তা। কর্ত্তার অনভিমতে কোনো কর্ম্মই হইতে পারে না। কনিষ্ঠাদি বড় বুজ্‌দার, বড় কর্ম্মক্ষম, বড় উপার্জ্জনশীল, বড় কীর্ত্তিকুশল হইলেও বিশেষ বিশেষ বিষয়ে কর্ত্তার অনুমতি ভিন্ন

কিছুই করিতে সমর্থ হয়েন না। তাহাতে কর্ত্তার যদি ভ্রম হয়, যতক্ষণ না তাঁহাকে বুঝাইয়া সম্মত করিতে পারেন, ততক্ষণ সাধ্য কি সে কর্ম্ম করেন? মনে করুন একটী সম্বন্ধ উপস্থিত, মনে করুন দলাদলির ঘোঁট উপস্থিত, মনে করুন বাটীর কোনো ছেলেকে বিদেশে কোনো কর্ম্মে পাঠাইতে হইবেক, তাহাতে কর্ত্তা যতক্ষণ মত না দিবেন, ততক্ষণ সেকাজ কি হইতে পাবে? বাটীর আবাল বৃদ্ধ বনিতা সকলকেই কর্ত্তার ইচ্ছানুসারে চলিতে হয়। তাহারাও তাহাতে ক্ষুব্ধ না হইয়া বরং তৃপ্তিপূর্ব্বক ঘাড় নত করিয়া থাকে! ও পক্ষে আবার কর্ত্তাও বিশেষ বিবেচনাপূর্ব্বক শাসন-দণ্ড চালনা করেন, অধিকাংশ বিষয়ে পরিবার পাঁচটীর মত ও ইচ্ছা জানিয়া আপন মতকে গঠন করেন। যে কাজে পরিবার মধ্যে সকলের অনিচ্ছা, তাহাতে তাঁহার নিজের ইচ্ছা হইলেও অনেক সময় তাহা পরিত্যাগ করিয়া থাকেন। এমন না হইলে কর্ত্তৃত্ব থাকিবে কেন? এমন না হইলে এমন সুন্দর সামঞ্জস্য কি এত কাল হিন্দু-পরিবারে অটুট্ থাকিতে পারিত? ফলতঃ এরূপ জ্যেষ্ঠ কনিষ্ঠ ভাব, এরূপ গুরু লঘু জ্ঞান, এরূপে বর্ষীয়ানের মান রক্ষা ও কনীয়ানের হিতাকাঙ্ক্ষা ভূমণ্ডলে আর কোনো রাজ্যে—আর কোনো সমাজে—আর কোনো জাতীয় পরিবারের মধ্যে কি পাওয়া যায়? হিন্দু-পরিবার একটী ক্ষুদ্র রাজ্য, তাহাতে নিয়ন্তা ও শাসনকর্ত্তার সমুদায় ভাবই মূর্ত্তিমান! হিন্দু-পরিবারের সুকর্ত্তৃত্ব যে করিতে পারে, একটী রাজ্যও সে চালাইতে পারে! সুসভ্য জাতিরা এই সংশ্লিষ্ট পরিবার-প্রণালীকে *(Patriarchal system.)* জনকত্ব-শাসন-প্রণালী বলিয়া থাকেন। তাঁহারা বলেন, সমাজের আদ্যাবস্থায় স্বল্প সভ্যতার সময় এই রীতি প্রবর্ত্তিত ছিল। এখন সমাজের অবস্থা তদপেক্ষা বহুগুণে উন্নত হইয়াছে, এখন স্বাধীনতার কাল, এখন কি আর তাহা শোভা পায়? আমরাও দেখিতেছি তাঁহাদের সমাজ ও গৃহ-সংসারের যেরূপ শৃঙ্খলা, তাহাতে ইহার উপযোগিতা কিছুতেই হইতে পারে না! শ্রুত আছে, *(Extremes meet together.)* আমাদের চলিত কথায় বলে "রাজা আর ফকির" "বুড়ো আর ছেলে সমান!" এ কথার তাৎপর্য্য চমৎকার! অত্যন্ত জ্ঞানাপন্ন সভ্য মানব আর নিতান্ত জ্ঞান-হীন পশু, এ দুয়ের আচরণ কোনো কোনো বিষয়ে আশ্চর্য্য-রূপে মিলে! যতদিন স্তনপানের আবশ্যক, যত দিন মাতৃ-যত্ন ব্যতীত জীবিত

থাকা অসম্ভব, তত দিন পশু পক্ষীর শাবকেরা মার কোল-যোড়া হইয়া থাকে; যেই মাত্র উড়িতে কি চরিতে শিখে, অমনি তাহারা মা বাপের স্নেহ মমতা ভুলিয়া যায়, মা বাপও তাহাদিগকে তাড়াইয়া দেয়! অত্যন্ত সভ্য জাতির মধ্যেও এই প্রথার প্রাবল্য দেখা যায়। সুতরাং রাজা আর ফকির, বুড়ো আর ছেলে বলিয়া যে প্রাচীন বাক্য আছে, তাহার সঙ্গে "সভ্যতম জাতি আর ইতর প্রাণী" এই নব্য শ্লোকও গাঁথিয়া দেওয়া যাইতে পারে!

অতএব সর্ব্বশুভপ্রেরয়িতা পরম পিতার নিকট প্রার্থনা করি, তিনি আমাদিগকে একটু অল্প সভ্য রাখেন সেও ভাল, তবু যেন পিতা পুত্রে, মাতা পুত্রে, ভাই ভাইতে বিচ্ছিন্ন হইবার প্রবৃত্তি হিন্দুমনে সঞ্চারিত করিয়া না দেন।

কেহ কেহ সংশ্লিষ্ট পরিবার প্রথায় দুইটী বিশেষ দোষ দেখাইয়া থাকেন। এক, ইহাতে আলস্য বর্দ্ধন করে। অর্থাৎ এক জনের স্কন্ধে দশ জনে ভর দিয়া নিশ্চিন্ত থাকে; স্বতন্ত্র থাকিলে স্বীয় স্বীয় জীবিকা নির্ব্বাহের পথ দেখিতে হইত, সুতরাং অলস থাকিতে পারিত না। দ্বিতীয় দোষ, স্ত্রীলোকে স্ত্রীলোকে বিবাদ। এই দুইটীকেই আমরা সত্য বলিয়া স্বীকার করি, কিন্তু অপকার ও উপকার তৌল করিলে অপকার ভাগ নিতান্ত লঘু হইয়া দাঁড়ায়। অতএব উপকার কয়টীর নামও উল্লেখ করা কর্ত্তব্য।

১ম। সামাজিক বল। সূক্ষ্ম সূক্ষ্ম তৃণ একত্রিত হইয়া হস্তী বন্ধনেরও রজ্জু হয়!

২য়। স্বভাবানুযায়ী কর্ত্তব্য-সাধন। পিতা পিতামহ, মাতা পিতামহী, ভ্রাতা ভগিনী, খুল্লতাত জ্যেষ্ঠতাত প্রভৃতি জগতের মধ্যে মনুষ্যের পরম আত্মীয় যাঁহারা, তাঁহাদের পরস্পরের প্রতিপালন ও স্নেহ-কারুণ্যে বদ্ধ থাকা, সম্পদ বিপদে সহায় হওয়া ইত্যাদি ব্যবহার যে স্বাভাবিক ও সৃষ্টিকর্ত্তার অভিপ্রেত কাজ, তাহাতে সন্দেহ কি? যদি বলেন, স্বতন্ত্র স্থলে থাকিলে কি সে সব হয় না? কখনই এরূপ হইতে পারে না। কথাতেই বলে "ভিন্ন ভাতে বাপ পড়্‌সী!"

৩য়। দৃষ্টি ও শ্রুতি-সুখ। এ যেমন দেখিতে শুনিতে একটী আশ্চর্য্য সুষমার বিষয়, তেমন কি পার্থক্যে সম্ভবে? "এ প্রশংসা অবশ্যই প্রার্থনীয়।

৪র্থ। উপচিকীর্ষা, ভক্তি, স্নেহ, আসঙ্গলিপ্সা প্রভৃতি প্রচুররূপে চরিতার্থ হইয়া পরম সুখের কারণ হয়।

৫ম। সর্ব্বোপরি স্ত্রীলোকের কুপ্রবৃত্তি নিবারণের এমন মহৌষধ আর নাই। তন্মাহাত্ম্য ইতিপূর্ব্বে বাহুল্য বলা হইয়াছে, সুতরাং পুনরুল্লেখের প্রয়োজনাভাব। অন্য অনুকুল হেতু না থাকিলেও শুদ্ধ এই এক কারণেই সংশ্লিষ্ট অবস্থান প্রথার জন্য অনুরোধ করা যাইতে পারে।

চতুর্থ অধ্যায়।

পরিবার মধ্যে পরস্পরের আচরণ ও অন্তঃপুরের আচার ব্যবহার।

সংশ্লিষ্ট পরিবার সম্বন্ধে যাহা বলা হইল, তাহাতে এ অঙ্গেরও কিয়দংশ ব্যাখ্যাত হইয়াছে। গুরুলোকের প্রতি নিকৃষ্টের ভক্তি প্রকাশ ও বশ্যতা-স্বীকার এবং নিকৃষ্টের প্রতি গুরু জনের অকৃত্রিম স্নেহ ও হিতকর শাসন হিন্দু-পরিবারে অনুপম।

আবার হিন্দু প্রভু ভৃত্যকে যে ইউরোপীয় আধুনিক সভ্য জাতির ন্যায় চুক্তিমূলক বেতন-ভুক্ একটা ভাড়া করা সামগ্রী ভাবেন না, তাহাদিগকে পরিবারের সামিলই জ্ঞান করিয়া থাকেন, ইহা কে না জানেন? বালকপুত্রকে পিতা তাড়না করিলে যেমন কাঁদিতে কাঁদিতে মার কাছে যায়, হিন্দু সংসারে ভৃত্যও ঠিক তদ্রূপে কর্ত্তা রাগ করিলে কি দৈহিক দণ্ডাদি প্রদান করিলে মুখের উপর জবাব দেয় না, আদালতে যাইয়া নালিসও করে না, সে কেবল গিন্নির কাছে গিয়াই আর্দ্দাস করে! গিন্নি শুনিয়া কর্ত্তার উপর বকিতে বকিতে তাহাকে কিছু আহার দিয়া তখন শান্ত করেন, কর্ত্তা বাটীর মধ্যে আইলে সকল ফেলিয়া আগে ব'দের কথা না বলিয়া থাকিতে পারেন না।

হয়তো ব'দের চেয়েও আর একজন পুরাতন চাকর ব'দেকে তখনি এই বলিয়া বুঝায় "চাকর আর ছেলে তফাৎ কি? মনিব আর বাপে ভেন্ন কি? তিনি শাসন ক'র্ব্বেন না তো কে ক'র্ব্বে? একবার বা মারেন, একবার বা কোলে টানেন!" হায় এ কি সামান্য সুখের সম্বন্ধ! ভৃত্যেরা ঐ স্নেহের পরিবর্ত্তে আবার প্রভুর প্রতি এত ভক্তিপরায়ণ ও কৃতজ্ঞ থাকে, যে, তাঁহার জন্য প্রাণ পর্য্যন্ত দিতে পারে! সকল স্থলেই এরূপ অবিকল, আমি তাহা বলিতেছি না, কিন্তু অধিকাংশই অভিন্ন এই প্রকার। যাঁহারা পল্লীগ্রামে পুরাতন প্রভু ও ভৃত্যের আচরণ দর্শন করিয়াছেন, আমি তাঁহাদিগকেই সাক্ষী মানিতেছি। আমি স্বচক্ষে দেখিয়াছি, প্রভু পীড়িত হইয়া দীর্ঘ কাল শয্যাশায়ী, সংসার চলেনা, চিকিৎসাদির জন্য সমস্ত জিনিস পত্র পর্য্যন্ত বন্ধক দেওয়া, ঋণের সীমা নাই! ভৃত্য জাতিতে ডোম, বাল্যাবধি ঐ প্রভুর লুন খাইয়াছে, প্রভুর এই অবস্থায় আপন স্ত্রী পুত্রকে দিবারাত্রি দ্বিগুণ খাটাইয়া ঝুড়িচুপড়ি বুনাইয়া, ধান ভানাইয়া এবং আপনি বিশ্রাম ত্যাগপূর্ব্বক নানা কাজ করিয়া, আপন সংসার ও প্রভুর স্বল্পসংখ্যক পরিবারের নির্ব্বাহ করিত। প্রভুর ঘর দুখানি মেরামত ভিন্ন চলেনা; বংশী কোথা হইতে বংশ আনিল, খড় আনিল, পাট কাটিল, আপনি সমুদয় করিল। কাষ্ঠ নাই, কোথা হইতে কাষ্ঠ আনিল কিছুই বুঝা যায় না। এই ভৃত্যের এই ব্যবহার সে পল্লীতে উপন্যাস হইয়া আছে! দেশের এ সুখের অবস্থা বিলাতী সভ্যতা যদি নষ্ট করে, তার চেয়ে আমরা একটু কম্ সভ্য থাকি সে কি ভাল নয়?

হিন্দুপরিবারে এরূপ আচরণের কথা সকলেই জানেন, সুতরাং এ অধ্যায়ে এ অংশটী এত লিখিবার আবশ্যক ছিল না। সুদ্ধ এক কারণেই এ প্রসঙ্গ প্রবন্ধের প্রত্যঙ্গ করিতে বাধিত হইতেছি। সমাজ মধ্যে যাহার ঐশ্বর্য্য হয়, আর সে যদি পাঁচটা সৎক্রিয়া করে, তবে তাহার কোনো কোনো দোষ থাকিলেও তাহা গণ্য হয় না, বরং তাহা আর পাঁচটা গুণের সঙ্গে বারুইয়ের গোচ-মধ্যস্থ পচা পানের ন্যায় বোঁটা গুন্তিতে চলিয়া যায়!

সেইরূপে ধরামণ্ডলে যখন যে জাতির জয় ভাগ্য ও লক্ষ্মী-ভাগ্য প্রবল এবং সেই জাতির মধ্যে যদি নানা প্রকার সুনিয়ম ও সুপ্রথা দৃষ্ট হয়, তবে সে জাতির আভ্যন্তরিক দোষ গুলিও সেই সব গুণের সঙ্গে গুণ বলিয়া চলিয়া

যায়। এবং যখন যে জাতির ভাগ্য-লক্ষ্মী দুর্ব্বাসার অভিশাপে ক্ষীরোদ-সাগরে নিমগ্না থাকে, তখন সে জাতির সাহস, বীর্য্য, প্রতিজ্ঞা প্রভৃতি সদ্‌গুণাবলীও মা লক্ষ্মীর অনুযাত্রী হয়। কিন্তু কতকগুলি সামাজিক ও পারিবারিক গুণ যে অতঃপরও সমাজ মধ্যে লুকাইয়া থাকিয়া যায়, তত্তাবতকে কেহই আর বড় লক্ষ্য করে না, তাহারা বরং দোষের দলেই গণনীয় হওয়াতে অভিমানে ম্রিয়মাণ থাকে।

অনুধাবন করিলে ভারতের জেতৃজাতি ও বিজিত জাতির মধ্যে অনেক বিষয়ে এই উপমা সম্পূর্ণ সংলগ্ন হইতে পাবে। আমাদের জেতৃজাতির বাহু-বল, বিদ্যাবল, সভ্যতাবল, বাণিজ্যবল, ঐশ্বর্য্যবল আমাদের অপেক্ষা বহু সহস্র-গুণে এত অধিক, সুতরাং বড় বড় বিষয়ে আমরা এত দুর্ব্বল যে, তাঁহাদের যে সকল বল নাই, তাহার বড়াই শুনিয়াও আমাদিগকে চুপ করিয়া থাকিতে হয়; এবং আমাদের সে সকল বল থাকিলেও আমরা বড়াই করিতে—মুখ পাতিতে পাই না! বিশেষতঃ আমাদের নব্য বাবুরা না জানিয়া না শুনিয়া সাহেবদিগের মতের পোষকতা করেন এবং সামাজিক কল্পিত হীনতার জন্য রোদন করেন, সাহেবেরাও যো পান! অথচ তত্তদ্বিষয়ে আমাদের হীনতা দূরে থাকুক, বরং আংশিক শ্রেষ্ঠতাই আছে। তাহার প্রমাণ স্বরূপ গুটিকতক বিষয় অদ্যাই প্রদর্শিত হইয়াছে এবং বক্ষ্যমান আরো দুই একটী কথা বলা যাইতেছে। আমাদের জেতৃ জাতীয় অনেকে জোর কবিয়া বলেন যে, হিন্দু গৃহিণীতে আর অন্য জাতীয়া দাসীতে কিছু মাত্র প্রভেদ নাই। প্রবন্ধটী যদি বিস্তারিত হইয়া না পড়িত, তবে আমি বাহুল্যরূপ প্রতিবাদ করিয়া তাহার সম্পূর্ণ অসত্যতা দেখাইয়া মনের ক্ষোভ নিবারণ করিতাম। তথাপি কিঞ্চিৎ না বলিয়া থাকিতে পারি না।

এখন যাঁহারা ইংরাজী শিখিয়া সভ্য হইয়াছেন, তাঁহারা মনে করেন, এত দিনের পর স্ত্রীলোকের গৌরব কেমন করিয়া করিতে হয়, তাহা দেশে দেখানো হইতেছে। কিন্তু ইংরাজী ভাষার যখন সৃষ্টি হয় নাই—ইংরাজ জাতি যখন জন্মে নাই—ইংরাজের গুরু রোমক বংশও যখন আবির্ভূত হয় নাই, তখন অবধি হিন্দুমহিলার কত আদর, কত গৌরব, কত মান তাহা শ্রবণ করুন।

যত্র নার্য্যস্তু পূজ্যন্তে রমন্তে তত্র দেবতাঃ।
যত্রৈতাস্তু ন পূজ্যন্তে সর্ব্বাস্তত্রাফলাঃ ক্রিয়াঃ॥ ঐ, ৫৬।

যে কুলে স্ত্রীলোকেরা বস্ত্রালঙ্কারাদি দ্বারা পূজিতা হয়েন, তথায় দেবতারা প্রসন্ন থাকেন। আর যে কুলে স্ত্রীদিগের অনাদর, সে বংশে সকল ক্রিয়া নিষ্ফল হইয়া যায়।

সন্তুষ্টো ভার্য্যায়া ভর্ত্তা ভর্ত্রা ভার্য্যা তথৈবচ।
যস্মিন্নেব কুলে নিত্যং কল্যাণং তত্র বৈ ধ্রুবং॥ ঐ, ৬০।

যে কুলে স্বামী পত্নীর প্রতি, পত্নী স্বামীর প্রতি সন্তুষ্ট থাকেন, সে কুলে নিশ্চয়ই সর্ব্বদা কল্যাণ বর্দ্ধিত হইতে থাকে।

জাময়ো যানি গেহানি শপন্ত্য প্রতিপূজিতাঃ।
তানি কৃত্যাহতানীব বিনশ্যন্তি সমন্ততঃ॥ ঐ, ৫৮।

ভগ্নী, পত্নী, পুত্রবধূ প্রভৃতি স্ত্রীলোকেরা অপূজিত হইয়া যে কুলে শাপ প্রদান করে, সে কুল ধন পশ্বাদির সহিত অভিচার হতের ন্যায় সর্ব্বতোভাবে বিনাশ প্রাপ্ত হয়।

এইরূপ বহু বহু স্থলে শাস্ত্রে পুরন্ধ্রী মহিলাবর্গের সম্মান ও সন্তোষ বর্দ্ধনের বিবিধ প্রকার বিধি প্রদত্ত হইয়াছে এবং আবহমানের ব্যবহারেও তাহা সম্যগ্‌রূপে সংরক্ষিত হইয়া আসিতেছে। আমাদের পুরস্ত্রীগণ গৃহকর্ম্ম স্বহস্তে করেন বলিয়া কি দাসী হইলেন? সেই সব গৃহকর্ম্ম কি তাঁহারা অনিচ্ছাতে, পুরুষের ভয়ে বাধিতা হইয়া পরের কাজ ভাবিয়া করেন? না, স্বেচ্ছাতে, সন্তোষে, সুখের কাজ ভাবিয়া করিয়া থাকেন? সেই কাজ করাতে গৃহমধ্যে তাঁহাদের গৃহিণীত্ব ও একাধিপত্যের অধিকারটী কি অণুমাত্র হীনাঙ্গ হয়? না, সাংসারিক তাবদ্ব্যাপার স্বচক্ষে দৃষ্ট ও স্বহস্তে কৃত হয় বলিয়া সর্ব্ববিষয়ক ক্ষমতার আরো আধিক্যই হইয়া থাকে? তাহাতে কি সংসারের সুশৃঙ্খলা ও পারিপাট্য সমধিক সাধিত হয় না? তাহাতে কি স্বামী পুত্র ভ্রাতা ভৃত্য যাহার যাহা পাইবার, যাহার যাহা খাইবার, তাহা যথোচিতরূপে প্রাপ্তি হওয়াতে সকলেরি সন্তোষ হয় না? তাহাতে কি তাঁহাদের শরীর ও মনের জড়তা নষ্ট ও স্বাস্থ্য লাভ হয় না? তাহাতে কি শরীর ও মনোবৃত্তির কীট-

স্বরূপ ও সর্ব্বপ্রকার কুপ্রবৃত্তির প্রবর্ত্তকস্বরূপ যে আলস্য, সেই আলস্য-রোগের প্রতীকার হয় না? তাহাতে কি কুসঙ্গ ও কুবিষয়ের আলোচনার সময়াভাব হইয়া মহোপকার জন্মে না? প্রসবকালে দেখিবেন, তখনকার শ্রমশালিনী রমণীরা বা কত সহজে এবং এখনকার নিষ্কর্ম্মা কার্পেট্-বুননীরা বা কতকষ্টে প্রসব হন?

আবার তাহাও বলি;—বিলাতে মধ্যবিধ ও সামান্য গৃহস্থঘরের গৃহিণীরা কি স্বহস্তে এইরূপে গৃহকর্ম্ম করেন না? আর অধিক বলিবার সম্ভাবনা থাকিলে, বিলাতের গৃহচিত্র বিলাতের গ্রন্থ হইতেই দেখাইতাম। সেখানকার ধনী ভিন্ন কাহার কয়টা চাকর চাকরাণী আছে? এদেশে যাঁহাদের সঙ্গতি আছে, তাঁহারাও কি দাসদাসী রাখিতেছেন না? কিন্তু সেরূপ যোত্রাপন্ন ব্যক্তি দেশের লোক সমষ্টির কত ভাগের কত ভাগ, তাহাও তো ভাবিতে হয়? অল্পাংশই তদ্রূপ সঙ্গতিমান, অধিকাংশই অপারক। সেই অসমর্থ শ্রেণীর উপায় কি ঠাওরাইলেন? আপনাদের লম্বা লম্বা উপদেশ দ্বারা লাভে হইতে সে সকল লোকের মাথা খাইয়া দেওয়া হইতেছে! পুরুষ পক্ষে এইরূপ উপদেশে একটী মহা কষ্টের সোপান তো পূর্ব্বেই রচিত হইয়াছে। বিদ্যালয়ে যখন দরিদ্র বালকেরা পড়ে, তখন উপদেশ পায় "সভ্য হও, সভ্য হও! পাদুকা পায় দেও, গায় পিরান পর, চায়নাকোট পর, ইত্যাদি!" তাহারা বাবু হইতে চেষ্টা করে, তাহাতেই অভ্যস্ত হয়। প্রথম শ্রেণী পর্য্যন্ত কায়ক্লেশে পড়ে। পিতা ভাবিতেছেন, ছেলে মানুষ হইল, আর চিন্তা কি? কিন্তু হায়! গ্রাম্য বিদ্যালয় ছাড়িয়া কোনো উচ্চ বিদ্যালয়ে যে পড়িবে, তাহার সে যোত্র নাই। ঐ পর্য্যন্তই শেষ হইল। পরে কর্ম্মের জন্য লালায়িত। দিব্য বাঙ্গালা জানে, কিঞ্চিৎ ইংরাজী ও সংস্কৃতও জানে, তথাপি যদি ৬। ৭ টাকা মাসিক বেতনের একটী চাকরী পায়, তবে যেন তাহার ঊর্দ্ধতন চতুর্দ্দশ পুরুষ পর্য্যন্তও বর্ত্তিয়া যায়! প্রথম হইতে সভ্য ও বাবু হইতে শিখিয়াছে, এখন আর পৈতৃক চাষ বাস, ক্ষৌরকর্ম্ম, সন্দেশ গড়া, তৈল ঘৃতাদি বিক্রয়, অথবা ব্রাহ্মণ হয় তো, যজনযাজন ভিক্ষা শিক্ষা প্রভৃতি কিছুই পারে না! এদিগে চাকরীও জুটে না—সর্ব্বনাশ—একবারে সর্ব্বনাশ! যত দিন গ্রন্থবিদ্যা ও পৈতৃক কাজ কি কোনোরূপ ব্যবসায় দুই শিক্ষা একত্র হইবার প্রণালী প্রবর্ত্তিত না হইবে, তত দিন এই সর্ব্বনাশই থাকিয়া যাইবে—দিন দিন ইহা বাড়িতেই থাকিবে!

এক্ষণে আবার লোকের অন্তঃপুরেও সেই সর্ব্বনাশ বাঁধাইবার চেষ্টা করা হইতেছে। চারিদিগে রব, "সভ্যা হও, ভব্যা হও, গোবরে হাত দিও না, নোংরা গোলাহাঁড়ী ছুঁয়োনা, খ্যাংরা হাতে ক'রোনা, আগুন-তাতে যেয়োনা! দাসীর কাজ ঠাকুরাণী হ'য়ে তোমার কি করা উচিত? যদি সারা দিন্ পা'ট্ নিয়ে থা'ক্‌বে, তবে মানসিক বৃত্তির কখন্ কর্ষণ ক'র্ব্বে? কখন্ তবে অবশ্য-কর্ত্তব্য কার্পেটের কাটি নিয়ে ব'স্‌বে?—সে না ক'ল্লে তো বিবীদের সভ্যতা পেতে পা'র্ব্বে না। অতএব খ্যাংরা, কুলো, হাঁড়ী, চুলো, ঢেঁকী, জাঁতা, ছাঁচকাটা, এ সব দূরে ফেল; বই ন্যাও, পশম ন্যাও, পোষাক পর, সমাজে যাও, বড় বড় সাধুভাষার কথা কও, আর দিবা রাত্রি কেবল শান্তি, স্বাস্থ্য, শারীরিক নিয়ম, মানসিক নিয়ম, মিতাচার, মিতব্যয়িতার আন্দোলন ক'রে জ্যেঠাই হ'য়ে ব'সে থাকো!!"

যাঁহারা বাহ্য-রূপে মুগ্ধ, তাঁহারা সংসার মধ্যে এই নবপ্রবর্ত্তিত ব্যবস্থা দেখিয়া হর্ষ-সাগরে সন্তরণ দিতে থাকেন। কিন্তু যাঁহাদিগের একটু তলিয়ে দেখা অভ্যাস, তাঁহাদের ভাগ্যে তদ্দর্শনে তত তৃপ্তিসুখ ঘটিয়া উঠে না। তাঁহারা দেখেন, এ প্রণালীতে মুখে যত, কাজে তত মিতাচার ও মিতব্যয়িতা, স্বাস্থ্য ও শান্তির সঞ্চার নাই! আমাদের পূর্ব্ব-পুরুষেরা "স্বাস্থ্য" শব্দটা জানিতেন না, মুখেও আনিতেন না, অথচ যথার্থ স্বাস্থ্য ভোগ করিতেন—এখনকার স্বাস্থ্য বিষয়ক প্রবন্ধলেখক ও বক্তৃতাকারকের অপেক্ষা চতুর্গুণ, ষষ্ঠগুণ, কখনো বা অষ্টগুণ আহার্য্য উদরস্থ ও অনায়াসে জীর্ণ করিয়া যথার্থই সুস্থ ছিলেন; আ'জ্ কা'ল্ আমাদের যুবক যুবতী ও বালক বালিকা পর্য্যন্ত "স্বাস্থ্য স্বাস্থ্য" করিয়া যত পাগল, ততই হীনবল হইতেছে—ক্ষুদ্র মৎস্য ও লঘু মুগের সূপও পরিপাক করিতে অক্ষম!! মিতাচারের কথা কি বলিব? যে মদ্য-পানে সদ্য জাতি-চ্যুত হইতে হইত, সেই গরলের স্রোত অনর্গল অবিরলরূপে সমাজের অন্দর বাহিরে প্রবাহিত হইতেছে!

মিতব্যয়িতাও সেইরূপ; যৎকালে অন্তঃপুরে তাহার প্রসঙ্গ লইয়া প্রিয়-সঙ্গিনীগণ মধ্যে ঘোর আন্দোলন চলিতেছে, হয় তো তৎকালে বহির্ব্বাটীতে মুন্সেফের পেয়াদা আসিয়া স্বামীর হাতে শমন খানি দিয়া গেল! দাস দাসী সূপকারিণী রাখিবার সঙ্গতি নাই, তবু রাখিতে হইয়াছে! উত্তম পশম, উত্তম

উত্তম সংবাদ পত্র, উত্তম উত্তম পুস্তক এসব সংগ্রহের পয়সা নাই, তবু যেমন করিয়া হউক যোগাইতেই হইয়াছে! সে টাকা কোথা হইতে আসিল? অবশ্যই তণ্ডুল, দ্বিদল, তৈল, লবণ ও পরিধেয় থানকাপড়, পূর্ব্বে যাহা নগদ টাকায় আসিত, এখন তাহার ঋণ হইয়া সেই টাকায় ঐ সভ্যতার আয়োজন হইয়াছে। দোকানীর অপরাধ কি? বৎসরাধিক হাঁটিয়া হাঁটিয়া না পাইয়া শেষে শমন করিল!

হায়! এ সব তত্ত্ব কেউ রাখে না! কেবল বলে—এদেশের স্ত্রীজাতি বড় দুর্ভগা, বড় দুঃখিনী, বড় তাপিনী, পরাধিনী, চাকরাণী! হা! কি বিষম ভ্রান্তি! তাহারা যদি চাকরাণী, তবে ঠাকুরাণী কে? তাহাদের যদি ক্ষমতা নাই, তবে সংশ্লিষ্ট-পরিবার-প্রথার এত যে বাধনী, যাহা ঋষিবাক্য হইতে আরম্ভ হইয়া পুরুষানুক্রমিক ব্যবহার ও সামাজিক বিজ্ঞ কর্ত্তৃক নিয়ত আদিষ্ট হইতেছে, সেই বন্ধনীকে শিথিল করিয়া দেয় কে? তাহাদের যদি ক্ষমতা নাই, তবে যে সব বাটীতে দোল দুর্গোৎসবাদি ক্রিয়া কলাপ বন্ধ, সে সব বাটীতে ছাপ্পান্ন কোটী ব্রতোপলক্ষে পুরোহিত ঠাকুর দিব্য হৃষ্ট পুষ্ট হন কিসে? তাহাদের যদি ক্ষমতা নাই, তবে যে সব সংসারে পুরুষের অনুষ্ঠেয় পৈতৃক ক্রিয়া কাণ্ড রহিত হইয়াছে, সে সব সংসারে দ্বিতীয় উৎসব উপলক্ষে দুই তিনটী দুর্গোৎসবের ব্যয় হয় কিসে? তাহাদের যদি ক্ষমতা নাই, তবে দেশের অন্য কারুকর অপেক্ষা স্বর্ণকার বড় মানুষ হয় কিসে? তাহাদের যদি ক্ষমতা নাই, তবে কায়স্থদের বল্লালী কৌলিন্য উঠিয়া "ইউনিভার্সিটী কৌলিন্য" চলিত করিল কে?

তাহাদের আবার ক্ষমতা নাই, যাহাদের জন্য পুরুষের সংসার ধর্ম্ম সকলি—যাহাদের জন্য শোভাময়ী পুরী—যাহাদের জন্য লক্ষ লক্ষ, কি কোটী কোটী মুদ্রার হীরা মণি মুক্তা স্বর্ণ রজত রাশি রাশি সভ্যা ধরণীতে প্রতি দিন ক্রয় বিক্রয় হইতেছে—যাহাদের সুচারু সজ্জার জন্য ঢাকা, শান্তিপুর, কাশী, অযোধ্যা প্রভৃতি শত শত স্থানের অসংখ্য বেশকারীরা বারমাস নিযুক্ত রহিয়াছে—যাহাদের মনস্তুষ্টির জন্য হিন্দু পুরুষমণ্ডলী মান, প্রাণ, ধর্ম্মকে উপেক্ষা করিয়া—ইন্দ্র চন্দ্র কুবেরের ভাণ্ডার লুঠিয়াও অর্থোপার্জ্জন করিতেছে!

তাহাদের মানের কি ইয়ত্তা আছে, যাহাদের গৌরবার্থ শাস্ত্র-কারেরা—

বনমূল-ফলাশী কঠোর-ব্রত নীরস কর্কশ ঋষিরাও এমন সরস নাম উৎপাদন করিয়াছেন—জায়া, ভার্য্যা, গৃহলক্ষ্মী, অঙ্কলক্ষ্মী, গৃহিণী, সহধর্ম্মিণী, অর্দ্ধাঙ্গ-রূপিণী ইত্যাদি! এই সব নামেতেই পঞ্চবর্ষীয় বালকও বুঝিতে পারে, যে, হিন্দু-মহিলা দাসী নয়; হিন্দু-মহিলা গৃহকার্য্য-কুশলা হইলেও পরিচারিকা নয়, হিন্দুমহিলা স্বামী-সেবিকা বলিয়া হিন্দু-পুরীর সৈরিন্ধ্রী নয়, হিন্দুমহিলা অতি উচ্চ মানের—অতিশয় আদরের—অতি গৌরবের—অতি যত্নের সামগ্রী!

তাহাদের ক্ষমতা আর মানের কি সীমা আছে, যাহাদের পরিতোষার্থই এবং যাহাদের প্রিয়পাত্রের সম্মানার্থই শাস্ত্রকারেরা ভ্রাতৃদ্বিতীয়া নামা ভ্রাতৃ-পূজা, আরণ্য-ষষ্ঠী নামা জামাতৃ-পূজা, সাবিত্রীচতুর্দ্দশী নামা স্বামী-পূজার সৎপ্রথা সমূহের সদ্বিধান করিয়া দিয়াছেন! ফল কথা, গৃহস্থাশ্রমে যাহাদের জন্যই সব! যাহাদিগকে শাস্ত্র ও ব্যবহার স্ত্রীও বলে, শ্রীও বলে—

"স্ত্রিয়ঃ শ্রিয়শ্চ গেহেষু ন বিশেষোঽস্তি কশ্চন।"

অতএব হিন্দুস্ত্রীকে দাসী ও পরাধিনী বলিয়া তাহাদের জন্য অঝোর নয়নে রোদন করার তাৎপর্য্য যে কি তাহা বুঝিয়া উঠা ভার!

"পরাধিনী" তাহারা অবশ্য। সে তো অন্যভাবে অধিনী নয়—কৌমার-কালে প্রতিপালক রক্ষক জন্মদাতা জনকের স্নেহের অধিনী—যৌবনে প্রেমময় পতির প্রেমাধিনী—বার্দ্ধক্যে যদি দুর্ভাগ্যে পতিহীনা হয়, তবে ভক্তিমান পুত্রের শ্রদ্ধাধিনী—যদি নিতান্ত দুরদৃষ্ট বশতঃ পতি-পুত্র-হীনা হয়, তবু দেবর ভাশুরাদি জ্ঞাতি বা সহোদরাদির কর্ত্তব্যাধিনী!

মনু। বাল্যে পিতুর্ব্বশে তিষ্ঠেৎ পাণিগ্রাহস্য যৌবনে।
পুত্রাণাং ভর্ত্তরি প্রেতে ন ভজেৎ স্ত্রী স্বতন্ত্রতাং॥ ৫অ, ১৪৮।

স্ত্রীলোক বাল্যে পিতা, যৌবনে স্বামী, স্বামী মরিলে স্বামীর সপিণ্ড, স্বামীর সপিণ্ড অভাবে পিতৃ সপিণ্ড, তদভাবে রাজার বশে থাকিবে। স্ত্রীলোক কখনো স্বাতন্ত্র্য অবলম্বন করিবে না।

পিত্রা ভর্ত্রা সুতৈর্ব্বাপি নেচ্ছেদ্বিরহমাত্মনঃ।
এষাং হি বিরহেণ স্ত্রী গর্হ্যে কুর্য্যাদুভেকুলে॥

পিতা, স্বামী, পুত্র, ইহাদের হইতে স্ত্রী কদাপি বিচ্ছিন্ন হইয়া থাকিতে ইচ্ছা করিবে না; যেহেতু এরূপ বিয়োগে পিতৃভর্ত্তৃ উভয় কুলই নিন্দিত হয়। অতএব স্ত্রীলোকের স্বাতন্ত্র্য, কি শাস্ত্র কি যুক্তি, কিছুরি গ্রাহ্য নহে। হিন্দু-স্ত্রীর যে অধীনতা, তাহার প্রকৃত ভাব ইউরোপীয়েরা এবং স্বদ্ধ ইউরোপীয় বিদ্যায় শিক্ষিত নবযুবকেরা বুঝিতে পারেন না। এমন অধিনী হওয়া তো গৌরবের বিষয়—এমন অধীনতার জন্যই হিন্দু-কুলে সমস্ত সভ্য জাতির মধ্যে—শত শত বর্ষের রাজকীয় অধীনতা সত্ত্বেও অদ্যাপি পবম পবিত্র সতীত্ব-নিধি শারদীয় পূর্ণ শশীর ন্যায় সুনির্ম্মল, সুশীতল, অতি শুভ্র সমুজ্জ্বল কিরণ বিকীরণ করিতেছে!

এস্থলে সেই পরাধীনতা-রূপ কল্পিত কলঙ্ক-ধারিণী ও আরোপিত শৃঙ্খল-বাহিনী হিন্দু-গৃহিণীদের পূর্ব্ব ও বর্ত্তমান আচরণ কিরূপ এবং কি ভাবে তাহারা সেই অধীনতাকে অঙ্গের অমূল্য অলঙ্কার অপেক্ষাও সাদরে বহন করিয়া থাকে, তাহা অতি সংক্ষেপে কিয়ৎপরিমাণেও বিবৃত হওয়া উচিত। হিন্দু-ধর্ম্মনীতি হইতে নিম্নোদ্ধৃত শাণ্ডিলী-বিবরণে পূর্ব্ব কালের গৃহদেবী-রূপিণী গৃহিণীর ব্যবহার প্রতীয়মান হইতে পারিবে।

"পতিব্রতা শাণ্ডিলী স্বর্গে গমন করিলে দেবলোক-বাসিনী সুমনা তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, দেবি! তুমি কি পুণ্য বলে এই সুরলোকে সমুপস্থিত হইলে? শাণ্ডিলী উত্তর করিলেন—

নাহং কাষায়বসনা নাপি বল্কলধারিণী।
ন চ মুণ্ডা চ জটিলা ভূত্বা দেবত্বমাগতা।
অহিতানি চ বাক্যানি সর্ব্বাণি পরুষানি চ।
অপ্রমত্তা চ ভর্ত্তারং কদাচিন্নাহমব্রুবং।
দেবতানাং পিতৃণাঞ্চ ব্রাহ্মণনাঞ্চ পূজনে।
অপ্রমত্তা সদা যুক্তা শ্বশ্রূশ্বশুরবর্ত্তিনী।
পৈশুন্যেন প্রবর্ত্তামি ন মমৈতন্মনোগতং।
প্রদ্বারি ন চ তিষ্ঠামি চিরং ন কথয়ামি চ।
অসদ্বা হসিতং কিঞ্চিদহিতং বাপি কর্ম্মণা।
রহস্যমরহস্যং বা ন প্রবর্ত্তামি সর্ব্বথা।

কার্য্যার্থে নির্গতঞ্চাপি ভর্ত্তারং গৃহমাগতং।
আসনেনোপসংযোজ্য পূজয়ামি সমাহিতা।
যদন্নং নাভিজানাতি যদ্ভোজ্যং নাভিনন্দতি।
ভক্ষ্যং বা যদি বা লেহ্যং তৎসর্ব্বং বর্জ্জয়াম্যহং।
কুটুম্বার্থে সমানীতং যৎকিঞ্চিৎ কার্য্যমেবতু।
প্রাতরুত্থায় তৎসর্ব্বং কারয়ামি করোমি চ।
প্রবাসং যদি মে যাতি ভর্ত্তা কার্য্যেণ কেনচিৎ।
মঙ্গলৈর্বহুভির্যুক্তা ভবামি নিয়তা তদা।
অঞ্জনং রোচনাঞ্চৈব স্নানং মাল্যানুলেপনং।
প্রসাধনঞ্চ নিষ্ক্রান্তে নাভিনন্দামি ভর্ত্তরি।
নোত্থায় যামি ভর্ত্তারং সুখসুপ্তমহং সদা।
অন্তরেষ্বপি কার্য্যেষু তেন তুষ্যতি মে মনঃ।
নায়াসয়ামি ভর্ত্তারং কুটুম্বার্থেঽপি সর্ব্বদা।
গুপ্তগুহ্যা সদা চাস্মি সুসংসৃষ্ট নিবেশনা।
এবং ধর্ম্মপথং নারী পালয়ন্তী সমাহিতা।
অরুন্ধতীব নারীণাং স্বর্গলোকে মহীয়তে।

দেবি! আমি শিরোমুণ্ডন, জটা ধারণ অথবা কাষায় বস্ত্র বা বল্কল পরিধান করিয়া এই লোক লাভ করিয়াছি, এরূপ বিবেচনা করিবেন না। আমি কখনো ভর্ত্তার প্রতি অহিতকর বা পরুষ বাক্য প্রয়োগ করি নাই; সর্ব্বদা অপ্রমত্ত ও যতব্রত হইয়া দেবতা, পিতৃলোক ও ব্রাহ্মণগণের পূজা এবং শ্বশ্রূ ও শ্বশুরের সেবা করিতাম; আমার মনে কখনই কুটিলভাবের আবির্ভাব হয় নাই; আমি কদাপি বহির্দ্বারে দণ্ডায়মান বা কোনো ব্যক্তির সহিত অধিকক্ষণ কথোপকথনে প্রবৃত্ত হইতাম না; কি প্রকাশ্য কি অপ্রকাশ্য কোনো হাস্যজনক ও অহিত কার্য্যের অনুষ্ঠান করিতে কখনই আমার প্রবৃত্তি হয় নাই; আমার ভর্ত্তা স্থানান্তর হইতে গৃহে প্রত্যাগত হইলে আমি সমাহিত চিত্তে তাঁহাকে আসন প্রদান পূর্ব্বক তাঁহার যথোচিত পূজা করিতাম; যে সমুদয় ভক্ষ্য বস্তু তাঁহার অপরিজ্ঞাত ও অনভিমত হইত, আমি কদাচ তৎসমুদয় ভক্ষণ করিতাম না; পুত্র কন্যা প্রভৃতি পরিজনদিগের নিমিত্ত

যে সকল কার্য্যের অনুষ্ঠান করা আবশ্যক, আমি প্রতিদিন প্রাতঃকালে গাত্রোত্থান করিয়া স্বয়ং ও অন্য দ্বারা তৎসমুদয় সম্পাদন করিতাম; আমার পতি কোনো কার্য্যোপলক্ষে বিদেশে গমন করিলে আমি কেশ-সংস্কার এবং গন্ধ মাল্য অঞ্জন ও গোরোচনা দ্বারা দেহের সৌন্দর্য্য সাধনে প্রবৃত্ত না হইয়া সতত সংযতচিত্তে বিবিধ মঙ্গল কার্য্যের অনুষ্ঠান করিতাম; যখন তিনি নিদ্রা-সুখ অনুভব করিতেন, তখন বিশেষ কার্য্য থাকিলেও আমি তাঁহারে পরিত্যাগ করিয়া গমন করিতাম না; পরিবার প্রতিপালনের নিমিত্ত সর্ব্বদা তাঁহাকে আয়াস দিতাম না; গুপ্ত বিষয় কদাপি প্রকাশ করিতাম না এবং নিরন্তর গৃহ সমুদয় পরিষ্কার রাখিতাম! যে নারী সমাহিত হইয়া এইরূপ ধর্ম্মপ্রতিপালন করেন, তিনি নিশ্চয়ই অরুন্ধতীর ন্যায় স্বর্গলোকে পরম সুখ সম্ভোগ করেন।”

ইউরোপীয়েরা পুরাকালকে লৌহ-যুগ এবং বর্ত্তমান কালকে স্বর্ণ-যুগ কহিয়া থাকেন। হিন্দুরা পূর্ব্বকালকে সত্যযুগ এবং আধুনিক কালকে কলিযুগ বলেন। উভয় জাতির পক্ষেই ঐ মীমাংসা স্বাভাবিক। কেননা, ঐশ্বর্য্য, সভ্যতা, ব্যবহারিক বিজ্ঞান প্রভৃতিতে ইউরোপ এখন যে পরি-মাণে উন্নত, ভারতবর্ষ জ্ঞান ও ধর্ম্মমূলক সভ্যতায় সেই পরিমাণে অবনত হইয়াছে, তাহাতে সন্দেহ মাত্র নাই। শাণ্ডিলীর উপাখ্যান শ্রবণ করিয়া হিন্দু-পতিব্রতার অনুপম সুখের সংসারের প্রতি যাহার না ভক্তি জন্মে, তাহার হৃদয় কেবল বগী গাড়ী, সাহেব বিবী, গড়ের মাঠ, এক ঘোড়ায় সাহেব আর ঘোড়ায় ম্যাম, বিবীর বিম্বাধরে হাস্য, উভয়ের প্রেমালাপে ভ্রমণ, ইত্যাদি রমণীয় দৃশ্য সর্ব্বদা ধ্যান করে, তাহার অন্যথা নাই! হিন্দু-পরিবারের বাহ্য-দৃশ্যের পরিবর্ত্তে ফল্গুনদী-প্রবাহের ন্যায় গুপ্ত প্রেম ও গুপ্ত সুখ যে বহিতে থাকে, মূঢ়জন-চিত্ত কি তাহা অনুধাবন করিতে পারে? শাণ্ডিলী, সাবিত্রী, সীতা, অরুন্ধতী, দময়ন্তী প্রভৃতি পরমা সাধ্বী সতীদের যুগ গিয়াছে, এখন কলি কাল, তথাপি অদ্যাপি হিন্দু-পরিবারে স্ত্রীজাতির কত অসংখ্য প্রকার ত্যাগ-স্বীকার ও অটুট ধর্ম্ম-বুদ্ধি যে বলবৎ আছে, তাহার সীমা করা যায় না! শাণ্ডিলীর গুণাবলীর সকলি যে এখন অভাব হইয়াছে, তাহা কদাচ নহে। বোধ করি, আ'জ্ কা'ল্ কলিকাতার কতিসংখ্যক পরিবার ব্যতীত সমস্ত বঙ্গীয় সংসারের স্ত্রীলোকেরা প্রাতঃকালাবধি রজনীতে শয়নসময় পর্য্যন্ত যেরূপ

আচরণ করেন, তাহা কাহারো অগোচর নাই। স্বহস্তে পাক, সকলকে আহার করাইয়া অবশিষ্ট যাহা থাকে তাহাই ভোজন, প্রাণান্তেও উত্তম সামগ্রী প্রিয় জনকে না দিয়া গ্রহণ না করা, অনেকের আবার এককালেই সে সুখে স্বেচ্ছা-ক্রমে বঞ্চিতা হওয়া, অনাটনের সংসারে বহু প্রকার সুবুদ্ধিযোগে ও সুকৌশল সহকারে পরিপাটী গৃহস্থালি দ্বারা সংসার নির্ব্বাহ করা, যথাজ্ঞান নানাবিধ মাঙ্গলিক লক্ষণ পালন করা এবং ধর্ম্ম কর্ম্মে, বাহ্যিক নয়, ঐকান্তিক—সমাজ বা গির্জ্জা-গমনের আড়ম্বর নয়, গৃহমধ্যেই যথাসাধ্য পরম শ্রদ্ধার সহিত ধর্ম্মানুষ্ঠান করা, ইত্যাদি কথা কাহারো অবিদিত নাই। সুতরাং বাহুল্যরূপে সে সকল চিত্রিত করা অনাবশ্যক।

আমরা জানি, অধিকাংশ স্ত্রীলোক মূর্খতা নিবন্ধন দ্বেষ, হিংসা, কলহ-প্রিয়া; আমরা জানি, তাহারা সেই মূর্খতা কারণেই বস্তুজ্ঞানে ও কর্ত্তব্যাব-ধারণে অত্যন্ত হীনা; আমরা জানি, তাহারা লঘুচেতা ও ক্ষুদ্রাশয়া; কিন্তু তদ্রূপ ক্ষুদ্র দোষ যতই থাকুক; তাহাদের বাহ্যসভ্যতার যতই অভাব হউক; বুদ্ধিবৃত্তি যতই অমার্জ্জিত থাকুক; মূল বস্তুতো আছে—নারীর প্রধান অলঙ্কার হৃদয়ের ঔৎকর্ষ আর পাতিব্রত্য ধর্ম্মতো আছে! যত কিছু সামান্য দোষ আমাদের স্ত্রীসমাজে প্রচলিত দেখা যায়, তজ্জন্য এত ব্যাকুলতার প্রয়োজন কি? এক্ষণে সুশিক্ষার সদুপায় হইয়াছে, তৎপ্রভাবেই অল্পকাল মধ্যেই সে সব অন্তর্হিত হইতে পারিবে! কিন্তু ভয় হয়, যে প্রণালীতে শিক্ষা দেওয়া হইতেছে, তাহাতে বুদ্ধি-বৃত্তির অতিশয় প্রাখর্য্য হইয়া পাছে আমাদের সদ্ভাব-রূপিণী রমণীকুলের হৃদয়ের সদ্ভাব-মাধুর্য্যের অসদ্ভাব ঘটিয়া উঠে! মনের কথা খুলিয়া বলিলেই পাগল হয়! আমাদের ঐ সব কথা শুনিয়া অনেক উগ্র সভ্য আমাদিগকে পাগল বলিয়া উপহাস করিতে পারেন, কিন্তু যেরূপ স্বাধী-নতার শিক্ষা দেওয়া হইতেছে, তাহাতে কি অবলাগণকে নিতান্ত প্রবলা ও স্বেচ্ছাচারিণী করিয়া দেওয়া হইতেছে না? এবং পূর্ব্বকার প্রার্থনীয় অধী-নতার যে প্রকার দোষোদ্ঘোষণ করা হইতেছে, তাহাতে কি আত্মীয় জনের অধীনতা ও দেশাচারের অধীনতার পরিবর্ত্তে তাহাদিগকে বাহ্য সভ্যতা ও অতিআচারের দাসী করিয়া দেওয়া হইতেছে না? স্নেহবান আপ-নার জনের বশ্যতা স্বীকার স্ত্রীজাতির স্বাভাবিক ধর্ম্ম, সে বশ্যতাকে অধী-

নতা ও দাস্য-বৃত্তি বলিয়া ঘৃণা করা হয় স্থূল বুদ্ধি, নয় বিকৃত বুদ্ধির কাজ, সন্দেহ নাই!

অধীনতা ও স্বাধীনতা কাহাকে বলে, তাহা অগ্রে ভাবিয়া দেখা উচিত। প্রাণ অথবা মাননাশের শঙ্কাতে অনিচ্ছাতে কাহারো আজ্ঞাবহন করাকেই অধীনতা বলা যায়। ইচ্ছাপূর্ব্বক মঙ্গলার্থী- জনের বশীভূত হওয়াকে অধীনতা বলা উচিত নহে। এবং কল্যাণ উদ্দেশে যে সব নিয়ম করা হয়, সে সকল নিয়মের শাসনে থাকাকেও অধীনতা আখ্যা দেওয়া যাইতে পারে না। অপিচ, কাহারো বশীভূত থাকিব না, কোনো নিয়ম-গণ্ডীর সীমা মান্য করিব না, আমি স্বাধীন জীব, কাহারো শাসন গ্রাহ্য করিব না, এরূপ ঔদ্ধত্যই কি স্বাধীনতা? গুরু লঘু সম্পর্কটী স্বাভাবিক, সুতরাং অবশ্যই ঈশ্বরাভিপ্রেত। পুরুষের অধীন রমণী, ইহাও স্বাভাবিক, সুতরাং অবশ্যই ঈশ্বরাভিপ্রেত। পরমাত্মীয় পিতা, ভ্রাতা, স্বামী, পুত্রের শুভ শাসন মান্য ও সমাজের মঙ্গলগর্ভ নিয়ম সকল *পালন করাতে অবলাজনের কিছুই অগৌরব নাই, বরং তাহাতে গৌরব,* মান, ধর্ম্ম, যশঃ, তৃপ্তি, আপদভাব এবং ভয়শূন্যতা প্রভৃতি অশেষ শ্রেয়ঃ সাধন হইয়া থাকে। তাঁহাদের তত্ত্বাবধান ও শাসন-রজ্জু হইতে বিচ্ছিন্না হওয়া তো স্ত্রীলোকের স্বাধীনতা নয়, অধঃপাতে যাওয়া!! অতএব হিন্দু-মহিলার যে অধীনতা আছে, তাহা সর্ব্বাংশে কল্যাণাস্পদ কিনা, ভাবিয়া দেখুন।

বোধ হয়, উন্নতি-পিপাসাতুর দেশীয় ভ্রাতাগণের চক্ষে এরূপ সুফলদায়ক অধীনতা কারাবরুদ্ধ লোকের অধীনতা-রূপে অনুভূত হয়। বিলাতে এরূপ অধীনতা তো নাই, সুতরাং তাঁহাদের তাহা অবশ্যই বিষবৎ অগ্রাহ্য হইবে! আমাদের দেশে পুরস্ত্রীগণ অন্তঃপুরে অবরুদ্ধা থাকেন বটে, কিন্তু সে যে ধর্ম্মের অনুরোধে, সে যে স্ত্রীজাতির অনুপম ভূষণ যে লজ্জা, সেই লজ্জার অনুরোধে; সে যে সেই পরম শান্তির অনুরোধে যে শান্তি মনুষ্যের গৃহমধ্যেই প্রাপ্য, বাহিরে নয়; সে যে সেই সতীত্ব-মাণিক্যের অনুরোধে যে সতীত্ব-রত্ন হিন্দু-জাতির রাজ্য ধন কীর্ত্তি মান সর্ব্বাপেক্ষা রক্ষণীয় পরম নিধি; ভায়ারা তাহা বুঝেন না! তাঁহারা চান্—কুলকামিনীরা নিতান্ত স্বাধীনা হবে; যদৃচ্ছাচারিণী হবে; যদৃচ্ছাগামিনী হবে; হাটে যাবে, সভায় যাবে, উৎসবে যাবে; বায়ু সেবনে যাবে, যথা ইচ্ছা তথায় যাবে; বারণ করিবার কেহই

থাকিবে না ; দেখিবার কেহই থাকিবে না ; শুনিবারও কেহ থাকিবে না ; জিজ্ঞাসিবারও কেহ থাকিবে না ; যথা ইচ্ছা—যাহার নিকটে ইচ্ছা—যাহার সঙ্গেই ইচ্ছা—যাইবে ! ভায়ারা বলেন, সেও যে জীব, তাহার পতিও সেই জীব, পতি যদি স্বাধীনভাবে যথায় ইচ্ছা যাইতে পারে, সেই বা না পারিবে কেন ?

হায় কি ভ্রান্তি ! পতি পত্নী—পুরুষ রমণী যে এক প্রকারই জীব, একথা কে বলিল ? আকারে ভিন্ন, প্রকারে ভিন্ন, স্বভাবে ভিন্ন, তাহাদের নির্ম্মাণে ঈশ্বরের অভিপ্রায়ও ভিন্ন ! এক জন কর্কশ, অন্যা মধুময়ী ! এক জন ব্যস্ত, অন্যা সুস্থা ! এক জন গুরুতর কঠিন কর্ম্মা, অন্যা লঘুকার্য্য-কুশলা ! এক জন সংগ্রহকারী, অন্যা ব্যবস্থা-কারিণী ! অধিক কি, এক জন সন্তানের জনক, অন্যা জননী ! এক জনের বিশাল বক্ষঃ নিতান্ত রসহীন, অন্যার কোমল হৃদয়খানি পয়ঃসুধাময়ী কাদম্বিনী ! একজন শ্রান্ত হইয়া আসিবে, অন্যে মধুর সম্ভাষে, মধুর সুহাসে, মধুর সেবায়, মধুর আহার্য্যাদি দানে সেই শ্রান্তি দূর করিবে—অস্থির প্রাণকে সুস্থির করিবে—শান্তিরূপিণীর শান্ত ব্যবহারে শ্রান্তি শান্তি হইয়া অন্তস্তলে শান্তিরস সিঞ্চিত হইবে ! এই জন্যই রামাভিষেক নাটকে রামের উক্তি এই—

কৃষক যখন কাতর শ্রমে ; নিদাঘ-তপন মস্তকে ভ্রমে ;
স্বেদজলে সিক্ত হ'য়ে ক্ষেত্র হ'তে আসে ;
কে তারে শীতল করে, মধুর সম্ভাষে ?
দানব-সমরে, অমর-পতি, অস্ত্রানলে দগ্ধ, ব্যথিত অতি ;
সুরপুরে প্রবেশিলে হয় প্রতীকার।
শচী-প্রেম-সুধা বিনা, কি ঔষধ তার ?
ভাস্কর সদত প্রখর করে, পয়োধি-জীবন শোষণ করে ;
তরঙ্গিণী-অঙ্গ-সঙ্গ, যদি না পাইত ;
ভেবে দেখ, সাগরের কি দশা হইত ?
রাজ্য-চিন্তানলে দহিব যবে, সেরূপে বল কে যুড়াবে তবে ?
বিনা ও বদন-বিধু-হাস্য-সুধাবৃষ্টি,
নীলোৎপল-দল তুল্য নয়নের দৃষ্টি ?

এমন হিন্দু-স্ত্রী আবার দাসী ! হা ঈশ্বর ! এরূপ বিজাতীয় অনুকরণের দাসগণের হস্তে আমাদিগকে রক্ষা কর !

হিন্দু-আচার-ব্যবহার—সামাজিক।

বাবু মনোমোহন বসু কর্ত্তৃক বাঙ্গালা ১২৭৯ সালের

ফাল্গুন মাসে "হিন্দুমেলায়" বিবৃত।

প্রথমভাগে জাতকর্ম্মাদি বিবাহের পূর্ব্ববর্ত্তী সংস্কার, বিবাহ, সংশ্লিষ্ট পরিবার এবং পরিবার মধ্যে পরস্পরের আচরণ ও অন্তঃপুরের আচার ব্যবহার, এই কয়টী প্রকরণে পারিবারিক আচার ব্যবহারকে বিভাজিত করিয়া যথাসাধ্য তদ্বিষয় সংক্ষেপে বিবৃত হইয়াছে। অদ্যকার এই দ্বিতীয় ভাগের নাম "হিন্দু-আচার-ব্যবহার—সামাজিক।" ইহাকে পরিচ্ছেদে বিভক্ত করিবার পূর্ব্বে সমাজ কি? সামাজিকতা কি? অধুনা হিন্দুসমাজ কি অবস্থায় অবস্থিত? ইত্যাদি একবার দেখা উচিত।

বহুসংখ্যক মনুষ্য কতকগুলি সাধারণ নিয়মের শাসনে বদ্ধ থাকিলে সেই জনসমূহের সমষ্টিকে সমাজ এবং তন্নিয়ম পালনকে সামাজিকতা বলা যায়। ঐ সব নিয়ম রাজ-ক্ষমতা-সম্ভূত নহে, কোনো ব্যবস্থাপক সভাকর্ত্তৃকও প্রায় বিধিবদ্ধ হয় না, সচরাচর উহা পরম্পরাগত প্রথাতেই জন্মে, অথবা ধর্ম্মশাস্ত্রের উপদেশে বদ্ধমূল হয়। যে সকল মনুষ্য এইরূপে মিলিত, তাহাদের মূল ধর্ম্ম প্রায় একবিধই হইয়া থাকে। অনেকে অনুমান করিতে পারেন, এক বংশোদ্ভব জনগণ লইয়াই একটী সমাজ হয়। কিন্তু সর্ব্বদা ও সর্ব্বদেশে তাহা নহে। তাহার সাক্ষী শিখ্‌সমাজ। নানক ও নানকের শিষ্যগণ যখন শিখ্‌-সমাজ স্থাপন করেন, তখন একজাতি হইতে উপকরণ প্রাপ্ত হন নাই। বহু জাতির লোককে আপনাদের মতাক্রান্ত করিয়া সমাজ বন্ধন করিয়াছিলেন। ক্রাইষ্ট এবং মহম্মদ প্রভৃতি ধর্ম্মপ্রবর্ত্তকেরাও যে বর্ণের, যে দেশের, যে বংশের লোককে লওয়াইতে পারিয়াছেন, তাহাকেই স্বীয় স্বীয় সম্প্রদায়-ভুক্ত করিয়া-

ছেন। কিন্তু তাহাকে ধর্ম্ম-সম্প্রদায় বলা যতদূর যুক্তিমূলক, সমাজ বলা ততদূর ন্যায়সঙ্গত হইতে পারে না। ইংলণ্ড, ফ্রান্স, জর্ম্মনি প্রভৃতি বহুজনপদবাসী লোকদিগকে এক ধর্ম্মসম্প্রদায়ের লোক বলা যাইতে পারে. কিন্তু তন্মধ্যে ভৌগোলিক ও রাজকীয় অবস্থা ভেদে প্রত্যেক স্থানের লোককে স্বতন্ত্র সমাজ বলা হয় এবং হয়তো তন্মধ্যে কোনো কোনো স্থানে অধিক সমাজও অবস্থান করিতেছে। যেমন, ইংলণ্ডমধ্যে ইংলিস-সমাজ ও য়ীহুদী-সমাজ। যেমন, আমেরিকাতে শ্বেত ও কৃষ্ণ, দুই পৃথক সমাজ। এ বিষয়ের জাজ্বল্যমান দৃষ্টান্ত জন্য দূরে দৃষ্টি করিবার আবশ্যক নাই, কেননা আমাদের জন্মভূমি ভারতবর্ষ অনেক সমাজের মুখ দেখিতেছেন। পূর্ব্বকালে অসভ্য আদিম অধিবাসীগণকে ধর্ত্তব্য না করিলে সুদ্ধ এক হিন্দু-সমাজই বিশাল ভারতরাজ্যে বসতি করিত। জেতৃ যবনজাতির অধিকার ও অধিবাস অবধি হিন্দু যবন দুই সমাজ হইল। যবনজাতির অপ্রতিহত পরাক্রম বশতঃ তাহাদের স্বীয় সমাজ ও সামাজিকতা অটুটভাবে বর্দ্ধিত হইয়া আসিয়াছে এবং সেই অপ্রতিহত পরাক্রমের হিংস্রস্বভাব জন্য তাহারা অধীন জাতির সমাজ, সামাজিকতা ও সামাজিকগণের সদ্গুণাবলী বিনষ্ট করিতে শত শত বৎসর বিজাতীয় আক্রোশের সহিত আক্রমণ করিয়াছে। সেই আক্রমণের ফল কি হইয়াছে? হিন্দু-সমাজ রাজকীয়-শক্তিতে বর্জ্জিত ও পুনঃ পুনঃ যুদ্ধে পরাস্ত হইয়া অবশেষে নির্বীর্য্য ও নিশ্চেষ্টবৎ সকল বিষয়েই অবনত ও বশীভূত হইল। তথাপি ধর্ম্ম পরিত্যাগে সম্মত হইল না—মারিয়া ফেল, কাটিয়া ফেল, যন্ত্রণা দিয়া বধ কর, বাড়ী লও, ভূমি লও, ধন লও, ঐশ্বর্য্য লও, কিন্তু জাতি ও ধর্ম্ম লইতে পারিবে না—এ দুটী কদাচ দিব না—যখন অসির আঘাতে, অগ্নিতে, ফাঁসিতে, তোপের মুখে প্রাণ যাইবে, এ দুটী সেই সঙ্গেই যাইবে—সহস্র নির্য্যাতনেও যবনরাজ তাহা স্পর্শ করিতে পারিবে না! এইজন্যই চিতোরের তেজীয়ান্ হিন্দুরা যখন দেখিল, যবন-দুর্গমে দুর্গ-রক্ষা আর সম্ভবে না, তখন সমর্থ পুরুষ মাত্রেই অলৌকিক রূপে শত্রুহননপূর্ব্বক শত্রুর অসি-মুখে এবং অসমর্থ মাত্রেই ভয়ঙ্কর অনলস্তূপ করিয়া সপরিবারে তাহাতে ঝম্পদানপূর্ব্বক যবনের অবশ্যম্ভাবী অত্যাচারে অব্যাহতি পাইল! এমন ঘটনা একবার নয়, ভারতবর্ষে হিন্দুবংশে অনেকবার ঘটিয়া গিয়াছে!

এইরূপ অনুপম মানসিক সাহসের সহিত হিন্দুরা জাতি ও ধর্ম্ম-রক্ষা করিয়াছিল। হিন্দুসমাজ ও সামাজিকতা ধর্ম্ম-মূলক। সুতরাং জাতি ও ধর্ম্ম-রক্ষা যাহাকে বলে, সমাজ ও সামাজিকতা রক্ষাও তাহাকে বলা যায়। যবনের অন্ন খাইলে হিন্দুর ধর্ম্ম নষ্ট হয় ও জাতি যায়, সুতরাং সমাজ ও সামাজিকতাও হারাণো হয়! অপরাপর জাতির মধ্যে ধর্ম্ম-নিয়ম, রাজকীয় নিয়ম ও সামাজিক নিয়ম পৃথক্। কিন্তু এক স্মৃতিশাস্ত্র মধ্যেই হিন্দুদের রাজা, প্রজা, গৃহস্থ, বানপ্রস্থ, দাতা গৃহীতা সকলের ব্যবস্থা এবং পারমার্থিক, সামাজিক ও রাজকীয় সকল নিয়মই আছে। যবনাধিকারে রাজ্যশাসন কর্ত্তব্যটী হিন্দুর হস্ত হইতে অন্যের হস্তে গেল, কিন্তু সামাজিকতা ও ধর্ম্মকর্ম্মানুষ্ঠানে অপর জাতি, অর্থাৎ রাজ-জাতি হস্তক্ষেপ করিতে পারিল না! হস্তক্ষেপ দূরে থাকুক, অদ্বিতীয় প্রতাপশালী দিল্লীর কোনো সম্রাটই কোনো হিন্দু প্রজাকে তাঁহার অতুলৈশ্বর্য্যময়ী, রাজ্য-ধন-মান-পদ-দাত্রী রাজপুরীতে এক দিনের জন্যও নিমন্ত্রণ করিয়া কিছু খাওয়াইবেন, তাহার যো ছিল না! তাহা দূরে থাকুক, কোনো যবন কোনো হিন্দুকে স্পর্শ করিলে, সে স্নান করিয়া শুচি না হইয়া গৃহে যাইতে পারিত না!

কিন্তু কালের পরাক্রম ও অভ্যাসের প্রভাব সর্ব্বাপেক্ষা বলবৎ। আ'জ্ যাহাকে পাপাত্মা অসাধু বলিয়া তাহার সঙ্গ-দোষের আশঙ্কায় তুমি মুখ ফিরাইয়া চলিয়া গেলে, যদি প্রত্যহ তাহাকে দেখিতে হয়, তবে তত ভয় তোমার থাকিবে না; যদি কার্য্যবিপাকে সর্ব্বক্ষণ তাহার সহিত একাসনে বসিতে, আলাপ করিতে, কি ব্যবহার করিতে বাধিত হও, তবে সে ক্রমে তোমার নিকট অসাধুর পরিবর্ত্তে অর্দ্ধেক সাধু হইয়া উঠিবে; ব্যাপক কালে তাহার সহিত এত বন্ধুতা হইতে পারে, যে, তুমি সহস্র দৃঢ়প্রতিজ্ঞ সাধুচরিত্র হইলেও ক্রমে তাহার দোষগুলি তোমার অজ্ঞাতসারে তোমাকে আশ্রয় করিবে! এক ব্যক্তির পক্ষে ইহা যেরূপ সম্ভব, এক জাতির পক্ষেও তাহা ন্যূন নহে। হিন্দুজাতি মুসলমানদের সহিত বহুকাল সহবাস করিতে করিতে তাহাদের প্রতি পূর্ব্বে যে ঘোরতর ঘৃণা করিত, তাহা বহুলাংশে পরিত্যাগ করিল। কিরূপে রাজা ও রাজপুরুষগণের অনুগ্রহভাজন হইব, অনেকেই এই পন্থা দেখিতে লাগিল। সেই পন্থা স্বরূপ যাবনিক ভাষা হিন্দুরা পড়িতে আরম্ভ করিল;

মুসলমান আমীর ওমরাহ রাজ-প্রতিনিধিদের দেখা দেখি বহু স্থানের বহু হিন্দু আপনাদের পৈতৃক বেশভূষা ও শিষ্টাচারের প্রণালী প্রভৃতি পরিবর্ত্তিত করিয়া যবনের অনুকরণে প্রবৃত্ত হইল।

অনেকে বলিয়া থাকেন, বেশভূষা ও সম্বোধন অভ্যর্থনাদির রীতিতে কি আইসে যায়? সে সমস্ত কেবল সভ্যতার বাহ্য চিহ্ন বৈতো নয়। কিন্তু, আন্তরিক ভাবের পরিবর্ত্তন ভিন্ন কি বাহ্য পরিবর্ত্তন হইতে পারে? যদিও তখনকার কোনো হিন্দুর মনে স্বীয় ধর্ম্মের প্রতি অণুমাত্র অশ্রদ্ধার সঞ্চার হয় নাই, কিন্তু সঙ্গদোষে, অথবা সঙ্গ-গুণেই বল, সামাজিক আচার ব্যবহারের মধ্যে অজানিতরূপে ক্রমে অনেক রূপান্তর ঘটিয়া উঠিল। অনেক হিন্দু রাজা, হিন্দু ভূস্বামী ও হিন্দুধনেশ্বরেরা আচার ব্যবহারে ও সামাজিক পাপে নবাবী ধরণ ধরিলেন—অনেক অনেক মধ্যবিধ লোককেও সেই সংক্রামক রোগে ধরিল! দীন দরিদ্র ইতর লোকদিগের কথা উল্লেখযোগ্যই নহে; সমাজের ঊর্দ্ধস্তরে যে দোষ গুণ বর্ত্তার, নিম্নস্তরে তাহার অল্পবিস্তর অবশ্যই দৃষ্ট হইয়া থাকে। সামাজিক রীতি নীতির ভাবান্তর তো সহজ কথা, আশ্চর্য্য এই ধর্ম্মবিষয়েও হিন্দুরা কিঞ্চিৎ পথ ছাড়িয়া দিয়াছে। তাহা না হইলে হিন্দুর বাটীতে কথায় কথায় সত্যপীর, একদিল, গোরাচাঁদ, সাজন্ম সাহেব, মাণিকপীর ও মুস্কিল আসানের সিন্নি ও ফয়তা দেওয়া হইবে কেন? যবনেরা বলপূর্ব্বক আপনাদের পীর পেকম্বরকে মানাইয়াছে, তাহা নহে। সামান্য হিন্দুরা পীর ও ফকিরের বুজরুগিতে মুগ্ধ হইয়া এবং স্ত্রীলোকেরা "ছেলে পুলে নে ঘর ক'র্ত্তে হয়, কোন্ দেবতা কোন্ ছলে কবে কার ঘাড় ভাংবেন" এই ভয়ে তটস্থ হইয়া হিন্দু মুসলমান উভয় জাতির দেবতাকেই মান্য করিতে ও পূজা দিতে লাগিল। হিন্দু পণ্ডিতেরা দেখিলেন, এ বিষয়ে সমাজের সাধারণ লোকের এবং আপনাদের ঘরে ব্রাহ্মণীদের এত দৃঢ় বিশ্বাস জন্মিয়াছে, যে, স্বয়ং শঙ্করাচার্য্য আসিলেও তাহা আর খণ্ডিত হইবার নহে! কাজে কাজেই তাঁহারা স্রোতে অঙ্গ ঢালিয়া দিলেন। কিন্তু তাঁহারা এমন পাত্র নহেন, যে, আপনাদের লভ্যাঙ্কপাতে উপেক্ষা করিয়া কোনো নূতন পদ্ধতিকে প্রবিষ্ট হইতে দিবেন! তাঁহারা তৎক্ষণাৎ সত্যপীরের সিন্নিকে শাস্ত্রমূলক দেব-পূজা করিয়া তুলিলেন! সংস্কৃত শ্লোকময়ী একখানি পুস্তিকা প্রস্তুত ও তাহাতে এই উপন্যাস

রচিত হইল, যে, বৈকুণ্ঠ হইতে নারায়ণ দেখিলেন. কলিযুগে কেহই কঠোর তপ করিতে সমর্থ নহে, অথচ জীবের পরিত্রাণ ও আশু কামনা সিদ্ধির কোনো উপায় চাই; আর্য্যাবর্ত্ত এখন যবনের অধীন, যবনের মনস্তুষ্টির সহিত হিন্দুরা ভক্তি-মার্গে চলিতে পারে এমন উপায় করা আবশ্যক; এইজন্য তিনি ফকির রূপে দীন দ্বিজ বিষ্ণুবশাকে দর্শন দান পূর্ব্বক উপদেশ দিলেন, "আমি নারায়ণ, পীররূপে কলিতে আবির্ভূত হইলাম; পঞ্চমোকামে কাঁচা পাকা সিন্নিতে আমার পূজা কর।" তদবধি সত্যপীর, সত্যনারায়ণ নামে পূজিত হইয়া আসিতেছেন।

ভারতবর্ষের কোনো কোনো ভাগের হিন্দুরা পূর্ব্ব নিয়মের বহির্ভূত আচার ব্যবহারও অবলম্বন করিল। এমন কি, নিষিদ্ধ আহার্য্য ও পানীয় উপভোগেও সঙ্কুচিত হইল না। যে সকল স্থানে মুসলমানেরা অত্যন্ত নির্দ্দয়াচরণে প্রবৃত্ত হইয়া স্থানীয় অধিকাংশ প্রধান লোককে বধ করিয়াছিল, অথবা পুনঃ পুনঃ রাজবিপ্লব দ্বারা যথাকার সমাজ উৎসন্নপ্রায় হইয়াছিল, বা হিন্দু অপেক্ষা মুসলমানদের বাস যেখানে বহুগুণে বেশী, কিম্বা যেখানকার প্রধানবর্গের সহিত যবননৃপতিগণের সমধিক আত্মীয়তা ও ঘনিষ্ঠতা জন্মিয়াছিল, সেই সেই স্থলেই এবম্প্রকার দশা ঘটিয়া উঠিয়াছে। অদ্যাপি তত্তৎ স্থানের হিন্দু অধিবাসীদিগকে নামে হিন্দু—কিন্তু কার্য্যতঃ অর্দ্ধেক হিন্দু অর্দ্ধেক মুসলমান বলিয়া বোধ হয়।

ফলতঃ ঘটনার বৈচিত্র্য, উপদ্রবের তারতম্য, ক্রমাগত দুর্দ্দান্ত একাধিপত্যের অধীনতা ইত্যাদি নানা কারণে হিন্দু সমাজের পূর্ব্ব গৌরব. পূর্ব্ব অবস্থা. পূর্ব্বকার ঐক্যভাব সম্পূর্ণ বিশৃঙ্খল হইয়া পড়িল। হিন্দুসমাজ উপর্য্যুপরি বহুশত বর্ষ ধরিয়া যে সব বাহ্য আক্রমণ সহ্য করিয়াছে, ইহাতে যে এককালে ধ্বংস প্রাপ্ত হয় নাই, ইহাই অত্যাশ্চর্য্য। অন্য সমাজ হইলে কখনই জেতৃজাতির সমাজে লীন না হইয়া থাকিতে পারিত না। আর্য্যাবর্ত্তের অসীম বুদ্ধিশালী ঋষি-প্রণীত সমাজ বলিয়াই আজো আমরা তাহার মুখাবলোকন করিতে পারিতেছি। এমন যে প্রাচীন গ্রীক ও রোমক জাতি, তাহাদের সমাজও বাহ্য আক্রমণে লয় প্রাপ্ত হইয়াছে। ইংরাজদিগের পূর্ব্ব পুরুষ স্যাক্সন সমাজকেও তাহাদের জেতৃজাতি গ্রাস করিয়াছিল। ভূমণ্ডলে হিন্দু

ভিন্ন অন্য কোনো জাতি এ বিষয়ে অধিক স্পর্দ্ধা করিতে পারে না। কেবল দুঃখের বিষয় আমাদের সমাজের অবয়ব আছে বটে, কিন্তু ঘোরতর বৈরপীড়নে চূর্ণাস্থি ও বিকলেন্দ্রিয় হইয়া রহিয়াছে! রাজনৈতিক বিষয়ে যে হিন্দুজাতি সভ্যতম শ্রেষ্ঠ জাতি ছিল, সে বিষয়ে সে হিন্দুজাতির জাতি পদতো অনেক দিন রহিত হইয়া গিয়াছে, অধিকন্তু ইহার সামাজিকতাও মিশ্রভাবাপন্ন ও ক্রমে নানা বিপজ্জালে জড়ীভূত হইয়া উঠিয়াছে।

সেই অবস্থাকেই আমরা বিপদের অবস্থা বলি, যে অবস্থাতে নিম্নলিখিত কয়েকটী প্রধান দোষ সমাজ মধ্যে সঞ্চারিত হয়;—

প্রথম। এক সমাজে নানারূপ বিরুদ্ধ আচার প্রবর্ত্তিত হওয়া। অর্থাৎ সমাজের সর্ব্বশ্রেণী মধ্যে পূর্ব্বে যে সব ব্যবহারের একতা ছিল, তাহার অভাব হইয়া যাহার যাহা ইচ্ছা সে তাহাই করে, এরূপ অবস্থা। ইহার অপর নাম স্বেচ্ছাচার। এই স্বেচ্ছাচার যে সমাজে প্রবল হয়, সে সমাজের শুভ-বন্ধন শিথিল হইয়া মহানিষ্টের উৎপত্তি হইতে থাকে। হিন্দু সমাজে মুসলমানদের সময়েই স্বেচ্ছাচার প্রথম পদার্পণ করে, কিন্তু বিশেষরূপে অথবা ভয়ানক আকারে আধিপত্য স্থাপন করিতে পারে নাই। কোনো কোনো স্থলে তাহার কিছু কিছু প্রভাব লক্ষিত হইত, এই পর্য্যন্ত। তাহাও অন্যত্র বেশী নয়, কেবল কোনো কোনো স্থানের বড় লোকের ঘরেই যাহা কিছু আদর পাইয়াছিল। বিশিষ্ট হেতুতে সেই সব বড় ঘরের নাম করা বিহিত নয়, কিন্তু উত্তর ও মধ্য ভারতবর্ষের কোনো কোনো প্রসিদ্ধ সংসারেই তাহার প্রচলন সংবাদ শুনা যায়। বঙ্গদেশে তৎকালে স্বেচ্ছাচারের প্রাবল্য হইতে পারে নাই। বঙ্গীয় সামাজিকগণ তাহাকে দূরে রাখিতে বিশেষ যত্নবান ছিলেন। এখন কিন্তু সেই দুরাত্মা তাহার প্রতিশোধ লইতেছে!

দ্বিতীয় দোষ—স্বার্থ। স্বাধীন অবস্থায় স্বদেশানুরাগ ধর্ম্মটী লোকের পরমারাধ্য থাকে। আপনার পরিবার প্রতিপালন ও ধনবৃত্তি সঞ্চয়ের চেষ্টা এক দিগে, রাজ্যের শুভাশুভ, প্রতিবাসীর মঙ্গলামঙ্গল ও সমাজের উন্নতি অবনতির তত্ত্বাবধান অন্য দিগে। অধিকাংশ লোকের, বিশেষতঃ ঐশ্বর্য্য, প্রতিভা ও জ্ঞানবান ব্যক্তিগণের এইরূপ যত্ন ব্যতীত দেশের কোনো প্রকার উত্তমতা থাকিতে পারে না। ইতিহাস পাঠে জানা যায়, বহুকাল পরাধীনতা

ভোগ করিয়া অনেক জাতি সে সদ্গুণে বঞ্চিত হইয়াছে। দুর্ভাগ্যক্রমে আমাদের হিন্দু সমাজ সেই সাধারণ দৃষ্টান্ত স্থলের অগ্রগণ্য হইয়া উঠিয়াছে। যে জাতি এত নিঃস্বার্থ ও সমাজ-হিত-পরায়ণ ছিল যে, তাহার শাস্ত্রকারেরা নিঃস্বার্থপরতার এমনই বিধান করিয়া গিয়াছিলেন যে,

ত্যজেদেকং কুলস্যার্থে গ্রামস্যার্থে কুলং ত্যজেৎ।
গ্রামং জনপদস্যার্থে আত্মার্থে পৃথিবীং ত্যজেৎ॥

যে জাতির ভোগত্যাগী ঋষিরা জনশূন্য তপোবনে বাস করিয়াও এবং সমুদয় সংসারসুখে আপনারা জলাঞ্জলী দিয়াও সমাজের হিতের জন্যই কেবল রাজসভায় ও সামাজিকগণের ভবনে আগমন পূর্ব্বক রাজা প্রজা সকলেরই ইহপারলৌকিক মঙ্গল কিসে সাধিত হইতে পারে, ইহার উপদেশ দিতেন, ধ্যানধারণা যোগতত্ত্বের মধ্যে তাহাও অনবরত চিন্তা করিতেন, এবং সমস্ত হিন্দু সমাজকে পরম নিঃস্বার্থ করিয়া তুলিয়াছিলেন ; স্বার্থের দিকে যে হিন্দুজাতির এতই অল্প দৃষ্টি ছিল যে; জিঘাংসা বৃত্তির সাক্ষাৎ শিষ্যরূপী, শস্ত্রমাত্রব্যবসায়ী হিন্দু ক্ষত্রিয় যোদ্ধারাও যুদ্ধকালে শত্রুকে কর-কবলে পাইলেও অন্যায় যুদ্ধে তাহাকে হত বা পরাস্ত করিত না ; বলিতে হৃদয় বিদীর্ণ হয়, সেই হিন্দুজাতি আ'জ্ স্বার্থের ক্রীতদাস—স্বার্থের নরক-কীট! রাজ্যের চিন্তা করিতে হয় না বলিয়া কেহ আর আপনার ধনমানের বিষয় ভিন্ন অন্য কোনো চিন্তাই করে না—কেহ কাহারো জন্য ভাবে না—সমাজের জন্য, ধর্ম্মের জন্য কোনো চিন্তাই করে না, তজ্জন্য স্বার্থত্যাগ তো বাহুল্য কথা! যবন-নিষ্পীড়নে আমাদের যত হীনতা হইয়াছে, ইহার ন্যায় কোনোটীই বিশেষ মন্দকারী নয়! যে দিন এ ভাবের পরিবর্ত্তন হইয়া পুনর্ব্বার নিঃস্বার্থ সামাজিকতার সঞ্চার হইবে, সেই দিন জানিব, ভারতের সৌভাগ্যসূর্য্য আবার নব-অরুণ-বেশে তরুণ কিরণ দিতে আসিয়াছেন!

তৃতীয় দোষ, স্বজাতীয় ভাষার প্রতি বিরাগ ও পরকীয় ভাষাতে অযথা অনুরাগ। কবে যে সংস্কৃত ভাষার সাধারণ প্রচলন রহিত হইয়া ভারতবর্ষে ভিন্ন ভিন্ন স্থানে ভিন্ন ভিন্ন ভাষার সৃষ্টি ও ব্যবহার আরম্ভ হইয়াছে, তাহার নির্ণয় করা দুঃসাধ্য। কিন্তু যে দিন তাহা হইয়াছে, সেই দিনাবধি ভারতের দুর্দ্দিনের সূত্রপাত, সন্দেহ নাই। এক সংস্কৃত ভাষা সমুদয় বিভাগের মাতৃভাষা

থাকাতে নিখিল ভারতবাসী সকলেই যেন এক মাতৃগর্ভজ ভ্রাতা ছিল। সংস্কৃত-জাত বিভিন্ন ভাষা বিভিন্ন রাজ্যের মাতৃভাষা হওয়াতে সম্পর্ক একটু দূরবর্ত্তী হইল—এক মায়ের সন্তান না হইয়া পরস্পরে যেন এক মাতামহীর দৌহিত্র হইয়া উঠিল। সুতরাং সহোদর ভাই আর মাস্‌তুতো ভাইতে যে প্রভেদ, তাহাই ঘটিল। তাহাতেও বড় একটা হানি ছিল না, প্রত্যেকের সেই মাতৃভাষা যদি সাধারণ জননী সংস্কৃত ভাষার অতুলৈশ্বর্য্যের অংশ পাইয়া স্বাধীনভাবে বর্দ্ধিত হইতে পারিত, তবে কয় ভগ্নী মিলিয়া জুলিয়া একটী সুখের সংসার চালাইতে এবং তত্তৎ-সন্তানগণের সমষ্টি সাহায্যে এক বিপুল বিক্রমশালী মহাসমাজের নেতা হইতে সমর্থ হইত। কিন্তু ভাগ্য আর এক প্রকার ব্যবস্থা করিল। পরাধীনতা-রাক্ষসীর তাড়নায় ভগ্নী কয়টী অস্থিচর্ম্মাবশেষ হইয়া শুকাইয়া গেল! তৎ-পরিবর্ত্তে বিজাতীয় লোকের রাজ্যাধিকারের সহিত পারসীক ভাষা তাহাদের সাম্রাজ্যের এক সীমা হইতে সীমান্তর পর্য্যন্ত অধিকার করিয়া বসিল। সংস্কৃত অধ্যাপকের আদর অপ্রকাশ্য, এবং পারসী ও আরবী ভাষাজ্ঞ ব্যক্তির সম্মান প্রকাশ্য হইয়া উঠিল। তথাপি আর্য্য-হিন্দুজাতির ধর্ম্ম-বুভুক্ষা ও জ্ঞানানুরাগকে ধন্য যে, যে বিদ্যায় অর্থ, যশঃ, মান, রাজপদ ও বৈষয়িক উন্নতি অতি অল্প, সেই সংস্কৃত বিদ্যার চর্চ্চাও তাঁহারা এককালে পরিত্যাগ করেন নাই। ব্রাহ্মণেরা বহু কষ্ট পাইয়াও অপ্রতিহত শাস্ত্রানুরাগে উত্তেজিত ছিলেন বলিয়াই আজো আমরা বেদ, বেদান্ত, উপনিষদ্, দর্শন, সাহিত্য, পুরাণ, জ্যোতিষ, কাব্য, ধর্ম্মনীতি প্রভৃতির মুখ দেখিতে পাইতেছি। হিন্দুর দেব-দ্বিজ-শাস্ত্র-দ্বেষী এবং দেবালয়-ধ্বংসকারী কাল যবনেরা তত্তাবৎ নির্ম্মূল করিবার জন্য নৃশংস যত্নের কি কিছুমাত্র ক্রটী করিয়াছিল? সেই উৎপীড়নে কত অমূল্য গ্রন্থ-রত্ন যে এককালে মর্ত্ত্যলোক হইতে অদৃশ্য হইয়া গিয়াছে, তাহা চিন্তা করিলে মহা শোকে মগ্ন হইতে হয়। সেই সঙ্গে যে আমাদের ব্যাস, বাল্মীকি, ভবভূতি, কালিদাসকে হারাই নাই, ইহাই যারপর নাই সৌভাগ্য! কিন্তু রাজা বৈদেশিক, রাজ-সরকারে সংস্কৃতের আদর নাই, তাহার আলোচনায় আর পেট ভরে না; দেখিয়া শুনিয়া আমাদের পূর্ব্ব-পুরুষগণ অর্থকরী রাজ-ভাষার আরাধনায় ব্যাপৃত হইলেন। শুদ্ধ ব্যাপৃত নয়, তাহাতে এত নিবিষ্টমনা ছিলেন যে, তন্ত্র পুরাণ স্মৃতি ও জ্যোতিষের যৎকিঞ্চিৎ অংশ ব্যতীত

অন্যান্য বহু শাস্ত্রের সত্ত্বা ও বহু বহু-গ্রন্থের নাম পর্য্যন্ত জানিবার সবকাশ পাইতেন না।

তাহার ফল কি হইয়াছিল? ফল এই হইয়াছিল যে, ক্রমে স্বদেশীয় ও স্বজাতীয় পূর্ব্বকীর্ত্তি, পূর্ব্ব-স্বাধীনতা, পূর্ব্বজ্ঞান ধর্ম্মের উন্নত অবস্থার জ্ঞান নিতান্ত স্থূল ও ভ্রান্তি-সঙ্কুল হইয়া উঠিতে আরম্ভ হইল। সে জ্ঞানও যে লব্ধ হইত, সে কেবল গুণার্ণব কাশীরাম দাস, পণ্ডিত কীর্ত্তিবাস এবং উত্তর পশ্চিমাঞ্চলের মহিমান্বিত তুলসী দাস, তথা পুরাণ ব্যবসায়ী বঙ্গীয় কথক-ঠাকুরদিগেরই গুণে। তাঁহারা যদি ভাষায় ভাষিত করিয়া না দিতেন, তবে রামায়ণ, মহাভারত ও পুরাণাদির সত্ত্বাও অন্যান্য দুরবগাহ শাস্ত্রের ভাগ্যাংশ ভোগ করিত, সন্দেহ নাই। এই সকল উপায়ে আমাদের পূর্ব্বপুরুষগণ তাঁহাদের বহু পূর্ব্বপুরুষের যে সকল বৃত্তান্ত অবগত হইতেন, তাহা ইতিহাসের জ্ঞান লাভের ন্যায় নহে, তাহা অলৌকিক উপন্যাসবৎ অথবা ধর্ম্ম শাস্ত্রের অঙ্গ, এই ভাবেই পাঠ বা শ্রবণ করিতেন। হিন্দুরা যে এককালে মহাভুজ-বীর্য্য-শালী, অতুল্য কীর্ত্তিমান ধর্ম্মপরায়ণ স্বাধীন জাতি ছিলেন; যদি যবনেরা আসিয়া ব্যাঘাত না জন্মাইত, তবে অদ্যাপি হিন্দুদিগের তদ্রূপ বা তদপেক্ষা উন্নত অবস্থা থাকিতে পারিত, এভাবে তাঁহারা সে সব পুরাণের বিবরণ গ্রহণ করিতেন না; দুর্দ্দান্ত যবনের নির্য্যাতনে তাঁহারা এত নিস্তেজ হইয়াছিলেন, তাঁহাদের জ্ঞান এত সঙ্কীর্ণ হইয়াছিল, স্বজাতিত্ব ও স্বাধীনতা-ভোগেচ্ছা একবারে এত নির্ম্মূল হইয়াছিল যে, তাঁহারা স্থির বিশ্বাসের সহিত ভাবিতেন, যে, যখন পুরাণ-বর্ণিত ক্ষত্রিয় বংশ ধ্বংস প্রাপ্ত হইয়াছে, তখন হিন্দুরা পরের অধীনতায় রহিয়া, পরের প্রেষ্যতা করিয়া, পরের মুখ চাহিয়া কেবল খাবে, পরিবে, থাকিবে—এই পর্য্যন্ত করিতেই ভগবান তাহাদিগকে অবনীতে রাখিয়াছেন! মহাভারত পাঠে তাঁহারা রাজা জন্মেজয় পর্য্যন্ত চন্দ্রবংশের ইতিহাস জানিতেন, তাঁহাকেই ক্ষত্রকুলের শেষ কুলপ্রদীপ ভাবিয়া রাখিয়াছিলেন। সে দীপ নির্ব্বাপিত হওয়াতে সব অন্ধকারময়—তাহার পরে আর কোনো ক্ষত্রিয় ভারতবর্ষে ছিল কিনা ইহা তাঁহারা জানিতেন না, জানিবার জন্য অনুসন্ধানও করিতেননা। সুতরাং গ্রীকবীর আলেকজাণ্ডারের আক্রমণ; পুরুভূপতির অসাধারণ মহত্ত্ব-মূলক মাহাত্ম্য; দিল্লীশ্বর পৃথুরাজাদির

বৃত্তান্ত; সমবেত ক্ষত্রিয়রাজগণ কর্ত্তৃক গিজ্নীর দুর্দ্ধর্ষ মামুদের প্রথমতঃ পরাজয়, পরে অদৃষ্টচক্রের দুর্নিবার আবর্ত্তনে তৎকর্ত্তৃক হিন্দু রাজলক্ষ্মী অপহরণ; সোমনাথে হিন্দুবীরগণের অসামান্য সাহস এবং পরবর্ত্তী শোচনীয় ঘটনা; পাল ও সেন বংশের বহু শত বৎসরের শাসন এবং মোগল সম্রাটগণের সহিত রাজপুত্রজাতীয়ের বহুকালব্যাপী অশ্রুতপূর্ব্ব অসাধারণ প্রতিদ্বন্দ্বিত্ব; এ সকল তত্ত্ব তাঁহারা কিছুই রাখিতেন না। কেবল মধ্য সময়ের রাজচক্রবর্ত্তী বিক্রমাদিত্যের ঐতিহাসিক নাম ও ঔপন্যাসিক অলৌকিক কীর্ত্তিকলাপের কথা তাঁহাদের শ্রবণবিবরে প্রবেশ করিয়াছিল, এইমাত্র। তাহাও কি ভাবে? তিনি নিজে মনুষ্য ছিলেন না, শিবানুচর তালবেতাল তাঁহার একান্ত আজ্ঞাপালক সহায় ছিল, এই ভাবে! সুতরাং বাদশাহের বাদশাই, যাহা তাঁহারা দেখিতে পাইতেন; নবাবের নবাবী, যাহার প্রভূত শাসনচক্রে তাঁহারা পেষিত হইতেন; রাজোপাধি ভূস্বামীবর্গের রাজাই, যাহার মোহকরী শক্তিতে তাঁহারা মুগ্ধ ছিলেন; ইহা ব্যতীত মনুষ্যের দ্বারা আর যে কখনো কিছু হইয়াছিল, কি অন্য দেশে হইয়াছে, কি এখন হইতেছে, কি এই দেশেই আবার হইতে পারে, ইহা তাঁহারা বড় বুঝিতেন না! তাঁহাদের সংস্কারের যোগ-ফল তবে এইরূপ;—ভারতবর্ষে পূর্ব্বে যাহা হইয়াছিল, আধুনিক কলিযুগে তাহা আর হইতে পারে না! শাস্ত্রে লিখিত আছে, কলিতে ম্লেচ্ছাধিপতি হইয়া ক্ষত্রিয়কুল নিবীর্য্য হইবে; ব্রাহ্মণ বেদহীন এবং শূদ্রের বেতন-ভোগী হইবে; বৈশ্য ও শূদ্র স্ব স্ব বৃত্তিত্যাগী হইবে; চাতুর্ব্বর্ণ আচারভ্রষ্ট হইয়া ম্লেচ্ছের দাসত্ব করিবে, ইত্যাদি সকলই বিপর্য্যস্ত, শ্রীভ্রষ্ট, সকলই হীনদশাপন্ন হইবে। অতএব যাহা ঘটিয়াছে, শাস্ত্রানুসারেই ঘটিয়াছে, তাহাতে আর কথা কি? এ অধীনতা, এ দাসত্ব, এ হীনতা অবশ্যম্ভাবী—অবশ্যই তাহা স্বীকার্য্য—অবশ্যই তাহা সহ্য করিতে হইবে! এই সংস্কারের বশবর্ত্তী হইয়া এবং নিতান্তই ভাগ্যের উপর নির্ভর করিয়া তাঁহারা এককালে নিশ্চিন্ত হইয়া পড়িলেন। চিন্তাহীনতার ফল জড়তা; সেই জড়তাবীজ উদ্যানময় ছড়াইয়া পড়িল—বিলাতী ভেরাণ্ডার ন্যায় একস্থান হইতে সকল স্থান ছাইয়া ফেলিল! লোকের হৃদয়-ভূমিতে স্বদেশানুরাগরূপ যে কল্পবৃক্ষ ছিল, তাহা শুষ্ক হইয়া গেল—স্বার্থনামা উজাড় বৃক্ষে বিশাল ভারতভূমি পরিপূর্ণ হইল!

এমন সময় চিরচঞ্চলা রাজকমলা ইন্দ্রিয়াসক্ত যবনকে পরিত্যাগ করিয়া দৃঢ়ব্রত সুকর্ম্মঠ সভ্যতম ব্রিটিস-অঙ্কে আশ্রয় গ্রহণ করিলেন। যবনাধিকারের শেষাবস্থা ও ব্রিটিসাধিকারের আদ্যাবস্থাতে হিন্দু সমাজের সামাজিক ভাব বড় বিভিন্ন হয় নাই। সামাজিকগণ সেই নিরুদ্যম, সেই নিশ্চিন্ত, সেই ভগ্নোৎসাহ, সেই হৃদয়-শূন্যই রহিল! ভদ্র বালকগণ গুরুপাঠশালে যৎকিঞ্চিৎ লিখিতে, পড়িতে ও অঙ্ক কষিতে লাগিল; অভদ্র বালকগণ গোচারণ, কৃষি বা পৈত্রিক ব্যবসায়ে পিতা ভ্রাতাকে সাহায্য করিতে লাগিল; ভদ্রযুবক ও প্রৌঢ়-বৃন্দ অর্থোপার্জ্জনে রত; অভদ্র যুবক ও বৃদ্ধও তাই। পলিতচর্ম্ম ধবলকেশ ভদ্র প্রাচীন মহাশয়েরা আহ্নিক পূজা, সংসারের তত্ত্বাবধান, শিশু পৌত্র ও শিশু দৌহিত্রের মনোরঞ্জন, বৈকালে কেহ বা মহাভারত, রামায়ণ, কবিকঙ্কণ পাঠে মগ্ন; কেহ বা পাষ্টি হাতে 'কচে বারো' বলিয়া বাহ্যজ্ঞান-শূন্য! সায়ং-সন্ধ্যান্তে প্রথমা রজনীতে পরিণত বয়সের বয়স্যদল কাহারো চণ্ডীমণ্ডপে বসিয়া হয় খোসগল্প, নয় ভ্রমাত্মক নিরর্থক রাজকী। বিষয়ে বিতণ্ডা, নয়তো দলাদলির ঘোঁট করিয়া (কুক্কুর-শব্দ ব্যতীত) নীরব গ্রামকে ঘোর নিনাদিত করিয়া তুলিতেন! এইতো আবাল বৃদ্ধ তাবতের দৈনিক জীবন ক্ষেপণের তালিকা, বড় ভাল কাজের মধ্যে পিতৃমাতৃ-শ্রাদ্ধ, দোল দুর্গোৎসব ও পুত্র কন্যার বিবাহ। বড় মন্দ কাজের মধ্যে বিবাদ বিসম্বাদ, লাঠিয়াল দ্বারা দাঙ্গা হাঙ্গামা ও মালিমোকদ্দামা। তখন যথার্থ সামাজিকতা-রত্নে দেশ বঞ্চিত্; কেবল দলাদলিরূপ সামাজিকতা মাত্র অবশিষ্ট। কর্ত্তারা তাহাতেই চিরজীবনের সুপক্ক বুদ্ধি, সংগৃহীত জ্ঞান এবং রাশীকৃত বহুদর্শন সমুদয় নিক্ষেপ করিয়া সন্তৃপ্ত।

তাহার পর খ্রীষ্টান মিসনরীগণ আগমন করিলেন। তাঁহারা কে, তাঁহা-দের আগমনের উদ্দেশ্য কি, সে সন্ধান হিন্দু সমাজের কেহই লইল না। যেইমাত্র দুই একটী হিন্দু যুবক পৈত্রিক ধর্ম্ম ত্যাগ পূর্ব্বক নবাগত শিক্ষকদের ধর্ম্ম গ্রহণ করিল, অমনি যেন ভীমরুলের চাকে ঘা পড়িল! কিন্তু কেবল গল্প, জনশ্রুতি ও হা হতোস্মি বৈ অন্য কিছু হইল না! পূর্ব্বে যেরূপ জড়তার লক্ষণ প্রদর্শিত হইয়াছে, তাহাতে কোনো কিছু হওনের সম্ভাবনাই বা কি? একদিকে হাহাকার অথচ অন্য দিকে প্রাণতুল্য সুকুমার হিন্দু-কুমারগণকে মিসনরী স্কুলে পাঠানো হইতেছে! এ যদি অন্য দেশ হইত, তবে কি রক্ষা

থাকিত? যাও দেখি, বিলাতের এক গণ্ডগ্রামের এক পার্শ্বে একখানি টোল বাঁধিয়া শ্রীমদ্ভাগবতের উপদেশ দেও দেখি—একটীমাত্র কৃষকের পুত্রকে গ্রীষ্টানি হইতে হিন্দুয়ানিতে কি ব্রাহ্ম ধর্ম্মেই আন দেখি, দেখ দেখি কি ঘটে? দেখ দেখি, কেমন তোমার টোলে কি তোমার সমাজগৃহে আর একটী ছাত্রও পড়িতে আসে? তখনই তাহারা গ্রামসুদ্ধ জড় হইয়া সভা করিবে, তখনি তোমার টোল বা সমাজগৃহ উঠাইয়া দিবে, তাহা না পারে তো নিদান এমন ব্যবস্থা করিবে, যে, একটী প্রাণীও তোমাদের নিকট আসিবে না! ইহা ভাল কি মন্দ, আমি তাহার বিচার করিতেছি না। সমাজের তীব্রতা ও একতা বুঝানই আমার অভিপ্রায়।

সে যাহা হউক, তাহার পরে রাজপুরুষগণ শিক্ষা ব্যাপারে মনোযোগী হইলেন। হিন্দু কলেজ প্রভৃতি বহু ইংরাজী বিদ্যালয় স্থাপিত হইল। সমাজ-রূপ স্থির বারিধিও আলোড়িত হইতে লাগিল! ক্রমে শিক্ষা প্রণালী এরূপ দাঁড়াইল যে, মাতৃ-ভাষা শিক্ষা না করিয়া এবং স্বদেশের পূর্ব্ববৃত্তান্ত কিছুই না জানিয়া হিন্দু বালকগণ একেবারে ইংরাজী আরম্ভ করিল। বাটীতে বৃদ্ধ পিতামহীর নিকট শুনিয়াছিল, আমাদের শাস্ত্রে বলে পৃথিবী ত্রিকোণ, চ্যাপ্টা, বাসুকির মস্তকে স্থিত, বাসুকি আবার কুর্ম্ম-পৃষ্ঠে আসন করিয়াছেন, ইত্যাদি। বিদ্যালয়ে ভূগোল পাঠকালে প্রমাণ পাইল পৃথিবী গোলাকার, সূর্য্যের চতুর্দ্দিকে শূন্যে ভ্রাম্যমান, মাধ্যাকর্ষণই ইহার অবলম্বন। তাহারা বাল্যাবধি শুনিতেছিল, রাহু নামক চণ্ডালের গ্রাসে চন্দ্র সূর্য্য পতিত হইলে গ্রহণ হয়; গঙ্গা দেবীর দৈবশক্তি বিশেষে জোয়ার ভাঁটা জন্মে এবং আলেয়া নাম্নী পেত্নী স্বীয় মুখ হইতে অগ্নি উদ্গীরণ দ্বারা পথিককে দিগ্‌হারা করিয়া অভিপ্রেত বিল মধ্যে লইয়া গিয়া পাঁকে মাথা পুতিয়া উর্দ্ধে পা তুলিয়া মারিয়া ফেলে! ইংরাজী পড়িয়া জানিল এ সমস্তই ভ্রান্তিমাখা কল্পনার বিজৃম্ভণ মাত্র! প্রকৃত তত্ত্বের সহিত এ সব মূর্খতার কোনো সংস্রব নাই! অন্ধকূপে চির-কারারুদ্ধ ব্যক্তির চক্ষে হঠাৎ সূর্য্য-কিরণ লাগিলে যেমন অসহ্য হয়, অত্যন্ত উত্তপ্ত হইয়াই জল পান করিলে যেমন সর্দ্দিগর্ম্মী হয়, আশাতিরিক্ত-রূপে এই সব প্রাকৃতিক তত্ত্বের সত্য সন্ধান সহসা লাভ করিয়া তাহাদের স্বীয় সমাজ ও পৈত্রিক ধর্ম্মশাস্ত্রের প্রতি ঘোরতর অশ্রদ্ধা জন্মিল, স্বদেশের

আচার ব্যবহার সমুদয়ই তাহাদের অসহ্য হইয়া উঠিল। পক্ষান্তরে, পাশ্চাত্য জ্ঞান, ধর্ম্ম ও সামাজিকতার প্রতি তাহাদের আন্তরিক অনুরাগ বর্দ্ধিত হইল। তখন দেশে ঘোর তান্ত্রিক ও পৌরাণিক কাণ্ড ভিন্ন হিন্দুধর্ম্মমধ্যে যে উচ্চতর ভাব আছে, তাহা একপ্রকার সকলেরি অজ্ঞাত ছিল। তখন কাজে কাজেই যাহারা কেবল বেশী ইংরাজীপণ্ডিত, তাহারা পৈতৃক ধর্ম্মের প্রতি এককালে প্রীতিশূন্য এবং ঘৃণাপূর্ণ হইয়া উঠিল। সে অবস্থায় তাহাদের মন কোনোরূপ পরিশুদ্ধ ধর্ম্মের জন্য যে লালায়িত হইবে আশ্চর্য্য কি? তখন খ্রীষ্টান ধর্ম্ম ব্যতীত আর কোনো বিশুদ্ধ শ্রেণীর ধর্ম্মের সত্তা ও তত্ত্ব তাহাদের কর্ণকুহরে প্রবিষ্ট হইত না, সুতরাং মগ্নতরীর ভাসমান লোকের কাষ্ঠফলকাশ্রয় সদৃশ সেই ধর্ম্মকে তাহাদের মধ্যে অনেকে আগ্রহ সহকারে আশ্রয় করিল। আবার তৎকালে যে অল্পসংখ্যক ইউরোপীয় খ্রীষ্টান এখানে আসিতেন, তাঁহাদের উচ্চ স্বভাব, সচ্চরিত্র, উন্নত ভাবময় বাক্য ও উদার কার্য্যকলাপ নবশিক্ষিত নবীন হিন্দুর চক্ষে দেবব্যবহারবৎ অনুভূত হওয়াতে তাঁহাদের ন্যায় বসন ভূষণ গ্রহণ ও তাঁহাদের আচার ব্যবহার শিষ্টাচারের অনুকরণে তাহারা প্রবৃত্ত হইল।

তৎপরে রাজা রামমোহন রায় হইতে ব্রাহ্মধর্ম্মের জ্যোতিঃ অল্পে অল্পে প্রখর দীপ্তি ধারণ করিতে লাগিল। এই নব ধর্ম্ম পূর্ব্ব প্রচলিত পৌত্তলিক এবং নবোপদিষ্ট খ্রীষ্টান উভয় ধর্ম্মেরই প্রতিদ্বন্দী বলীয়ান যোদ্ধৃবেশে রণ-ভূমিতে অবতীর্ণ হইল। কিন্তু এই ধর্ম্মের সার বিবেচনা করিলে ইহা কোনো ধর্ম্মেরই বিরোধী নহে, অথচ খ্রীষ্টান ধর্ম্ম-বিস্তারের প্রতিবন্ধক এবং দেশের প্রচলিত ধর্ম্ম-প্রকরণের সংশোধকরূপে প্রকাশ পাইতে লাগিল। কেননা, খ্রীষ্টান ধর্ম্ম গ্রহণে হিন্দু সন্তানকে যেমন জাতি ও সমাজ-চ্যুত হইতে হইত, ব্রাহ্মধর্ম্ম গ্রহণে তাহার কোনো সম্ভাবনা ছিল না। তরুণবয়স্ক শিক্ষিত হিন্দুরা দেখিল, কিয়দ্দিন পূর্ব্বে তাহাদের যে শাস্ত্রকে ভ্রান্তিসঙ্কুল, অসত্য, প্রাকৃতিক-তত্ত্ব-বাহক ও দুর্নীতি-বোধক পৌত্তলিক বলিয়া উপেক্ষা করা হই-য়াছে, তন্মধ্যেই পরম সত্য নিহিত আছে। তাহারা দেখিল, পৌরাণিক ধর্ম্মের ন্যায় খ্রীষ্টান ধর্ম্মেও অবতার ও অলৌকিক ঐশ্বরিক ক্রিয়াদি রহিয়াছে; কেবল দেশীয় জংলাভাব ও বিলাতী পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন ভাবে যে প্রভেদ, নতুবা উভয় ধর্ম্মই প্রায় সম-ধর্ম্মাক্রান্ত। তাহারা দেখিল, নবোদিত ব্রাহ্মধর্ম্ম সে দোষে

মুক্ত এবং তদ্ধর্ম্ম অবলম্বনে সমাজ-চ্যুতিরূপ দুঃখ ও পিতৃ-মাতৃ-বর্জ্জনরূপ মনস্তাপ ভোগ করিতে হয় না, অথচ দেশী বিলাতী পৌরাণিক ধর্ম্মের হাতেও অব্যাহতি পাওয়া যায়। তাহারা এই সব এবং আরও কত কি দেখিল; দেখিয়া শুনিয়া, ভালরূপে বুঝিয়া খ্রীষ্ট-ধর্ম্মে দীক্ষিত হইতে আর বড় অগ্রসর হইল না—অধিকাংশ শিক্ষিতগণ ব্রাহ্ম-সমাজে প্রবেশ করিল।

এস্থলে বলা উচিত যে, আমরা সমাজের কথা বলিতেছি, ধর্ম্মের বিচার আমাদের উদ্দেশ্য নহে; আপন আপন পরকালের কল্যাণ উদ্দেশে যাঁহার যাহা ভাল বোধ হয়, তিনি সেই ধর্ম্মেরই আশ্রয় গ্রহণ করুন। কিন্তু তাহা বলিয়া সমাজকে নষ্ট করার অধিকার কাহারো নাই। ঈশ্বরকে যিনি যে ভাবেই ডাকুন, কিন্তু ঐহিক উন্নতি ও সুখ লাভের জন্য সকলে সমবেত হইয়া এক মতে ও এক পথে চলিতে চেষ্টা করা নিতান্ত কর্ত্তব্য। দুঃখের বিষয়, ব্রাহ্মগণ ঠিক চলিতে পারিলেন না। কালে তাঁহাদের পদস্খলন আরম্ভ হইল। তাঁহাদের মধ্যে এক ঘোর অনিষ্ট আসিয়া জুটিল। ব্রাহ্মগণের মধ্যে দলাদলি উপস্থিত হইল। আদি ব্রাহ্মগণ পূর্ব্ব সমাজ ও সামাজিকতাকে রক্ষা পূর্ব্বক ব্রহ্মোপাসনার ইচ্ছুক। নব উন্নতিশীল ব্রাহ্মেরা সমাজ-বিপ্লব অভিলাষ করিতে লাগিলেন। মতের সামঞ্জস্য না হওয়াতে শীঘ্র তাঁহারা দুই দলে পৃথক্ হইলেন। শেষোক্ত সম্প্রদায় মধ্যে আবার মত-ভেদ আরম্ভ হইল। কতকগুলি লোক স্ত্রীসমাজের পূর্ব্ব নিয়ম হইতে এককালে বহির্গত হইয়া নিতান্ত ইউ-রোপীয় ধরণের স্ত্রী-স্বাধীনতার জন্য লোলুপ হইলেন। এইরূপে হিন্দু সমাজ নিশ্চল ভাব হইতে এককালে অসম্ভব ও অস্বাভাবিক উদ্যমশালিতায় উপ-স্থিত হইল। কিন্তু "ক্ষীণে বলবতী" কথাটা বড়ই ভয়ানক! ইহার ফল প্রায়ই বিষময় হইয়া থাকে।

ইংলণ্ডে পিউরিট্যানগণ এক দিন বড়ই ক্ষেপিয়া উঠিয়াছিল: ধর্ম্মশাস্ত্রে যেমন বলে এবং যুক্তিতে যাহা কিছু ন্যায্য বলিয়া সিদ্ধান্ত হইত, তাহারা তদনুরূপ উপাসনা ও আচরণ করিতে সংকল্প করিল। দেশের প্রচলিত ধর্ম্ম, রাজশক্তি, রাজ্যশাসনপ্রণালী ও সামাজিক আচারে তাহাদের যুক্তিতে অনেক দোষ লক্ষিত হইতে লাগিল, তাহারা সেই সমস্ত দোষের নিরাকরণ পূর্ব্বক যাহাতে সমাজে শাস্ত্রানুরূপ ও যুক্তিমূলক বিশুদ্ধ উপাসনা ও আচার-পদ্ধতি

প্রচলিত হয়, তাহারই চেষ্টা করিতে লাগিল। এ চেষ্টা নিন্দনীয় নয়। কিন্তু যে বিষয় আবহমান কাল ধরিয়া চলিয়া আইসে, সে বিষয় উঠাইয়া বলপূর্ব্বক অথবা যুক্তি দান পূর্ব্বক সহসা নব প্রথা প্রবর্ত্তিত করা কখনই হইতে পারে না। নবরীতি প্রবর্ত্তনের নিমিত্ত শুদ্ধ শাস্ত্র প্রদর্শন ও যুক্তিমার্গ অবলম্বনই যথেষ্ট নহে। তজ্জন্য প্রবর্ত্তককে অগ্রে লোকের বিশ্বাসভাজন হওয়া আবশ্যক। তাঁহার অভিপ্রায় যে সাধু, তিনি যে সমাজের যথার্থ হিতৈষী, তিনি যে সমাজের একজন, তিনি যে বিদ্যাসাধ্য সদভিপ্রায় প্রভৃতি সর্ব্বপ্রকারে একজন বিশেষ কাজের লোক, এমন বিশ্বাস অগ্রে জন্মাইয়া তাহার পর মাধুর্য্যভাবে সময় ও অবস্থার প্রতি দৃষ্টি রাখিয়া এবং বিশেষ ধৈর্য্যসহকারে লোকের হৃদয়কে পরিবর্ত্তনের বীজ ধারণের জন্য প্রস্তুত করিয়া, শনৈঃ শনৈঃ অভীষ্ট সিদ্ধ করিতে হয়। নতুবা লম্ফ দিয়া সমাজের গণ্ডী ছাড়িয়া সঙ্গীগণকে পশ্চাতে ফেলিয়া অভিমান ও স্পর্দ্ধারূপ উচ্চ স্থান আরোহণ করিয়া বুকে হাত দিয়া বাহাদুরীস্বরে গলা ছাড়িয়া ডাকিয়া বলিলেই হয় না, যে— "ওগো! তোমাদের আচার ব্যবহারে বড় দোষ; তোমরা জানিতে পার নাই, আমি জানিয়াছি; তাই তোমাদের সংশোধক ও পথপ্রদর্শক হইতে আসিয়াছি; তোমরা এই দণ্ডেই আমার পথে আইস—আর অন্ধকারে থেকো না।" এ অবস্থায় তাহার কথা শুনিয়া লোকে গ্রাহ্য না করিয়া যে করতালি দান পূর্ব্বক বিদ্রূপের বিকট হাসি হাসিয়া গায় ধূলা নিক্ষেপ করিবে, সন্দেহ নাই! পিউরিনিট্যানদের সেই দশাই ঘটিয়াছিল। তাহাদের সেই শুভ-চেষ্টায় যোগ দেওয়া দূরে থাকুক, দেশের অধিকাংশ লোক তাহাদের গোঁড়ামী, তীব্রতা, অসহিষ্ণুতা এবং অস্বাভাবিক তৎপরতা দেখিয়া ঘৃণা করিতে লাগিল! পিউরিট্যানেরা প্রায় হাসিত না, কোনো প্রকার সামাজিক আমোদ উৎসবেই লিপ্ত হইত না, শোভাকর বসন ভূষণ ধারণ করিত না, সর্ব্বদা গম্ভীর ভাবে থাকিত, সকল কথাতেই ধর্ম্মতত্ত্ব আনিত, সকল কার্য্যেই ঈশ্বরকে ডাকিত! উঠিতে, বসিতে, খাইতে, শুইতে তাহাদের অঙ্গভঙ্গীও যেন কেমন এক প্রকারের ছিল! এই সব কারণে তাহারা নিয়ত হাস্যের আস্পদ হইয়া উঠিল! এমনি হইল যে, পিউরিট্যানকে দেখিবামাত্রই লোকে হাসিত, অসম্ভ্রমের কথা কহিত! তাহারা যেন সমাজের সং

হইয়া উঠিল—লোকে রাস্তা ঘাটে নাট্যালয়ে তাহাদিগকে বা তাহাদের কথা লইয়া রং করিতে লাগিল!

এমন বিশুদ্ধ অভিপ্রায়ের এমন ফল হইবার কারণ কি? তাহার কারণ সুদ্ধ তাহাদের অতিগমন! সহজে অল্পে অল্পে স্বভাবের নিয়মানুসারে উন্নতি সাধন না করিয়া তাহারা একেবারে একদিনে সকল দোষ ও সকল ত্রুটী নিরাকরণ করিতে উদ্যত হইল; একদিনেই মানব-প্রকৃতির সঙ্কীর্ণতা ঘুচাইয়া সম্পূর্ণতা সাধন করিতে চেষ্টা পাইল; যে দেশাচারের মূল শিকড় শত শত বর্ষ ধরিয়া বর্দ্ধিত হইয়া পাতাল ফুঁড়িয়া বলিরাজার মস্তকে গিয়া ঠেকিয়াছে, এক দিনেই তাহাকে উৎপাটিত করিয়া, তৎস্থানে নবতরুকে বদ্ধমূল করিতে যত্ন করিল; সুতরাং অসম্ভবের সাধনে যেমন নিরাশ হইতে হয়, তাহাই হইল!

যাহাদের মনে বিচারশক্তি অপেক্ষা কল্পনাশক্তি সমধিক তেজস্বিনী—যাহারা "সু" ও "কু" যে দিগে যখন যায়, সেই দিগেই তখন প্রয়োজনের অতিরিক্ত গতিতে গমন করে, তাহারা ভিন্ন সে দলে যোগ দিতে অন্যের রুচি হইবে কেন? প্রতি সমাজে এমন অতিগমনশীল লোক কজন থাকে? সুতরাং সাধারণ সমাজকে তাহারা আকর্ষণ করিতে অশক্ত হইবেই হইবে। লাভের মধ্যে তাহাদিগকে একটী স্বতন্ত্র সম্প্রদায় হইয়া থাকিতে হয়।

যে পিউরিট্যানদের কথা বলা গেল, তাহারা ইংলণ্ডে তৎকালে এত প্রবল হইয়াছিল যে, রাজার সহিত ও শেষে পার্ল্যামেণ্টের সহিতও যুদ্ধ করিয়া জয়ী হইতে পারিয়াছিল; চার্লস ভূপতির দোষের বিচার করিয়া তাঁহাকে ফাঁসিতে বধ করিল এবং আপনারাই দেশাধিপ হইয়া উঠিল। এত করিয়াও তবু তাহাদের নবপ্রণালীকে স্থায়ী রাখিতে পারে নাই। যেই মাত্র ক্রমওয়েলের মৃত্যু হইল, অমনি পূর্ব্ব প্রণালী চতুর্গুণ বলের সহিত—পূর্ব্বাপেক্ষা চতুর্গুণ দোষ গুণের সহিত পুনঃস্থাপিত হইয়া উঠিল! "সর্ব্বমত্যন্তং গর্হিতং" এই প্রাচীন জ্ঞানবাক্য কোথায় যাইবে? অতিশয় গোঁড়ামী এবং লম্ফ-ঝম্ফ-বিশিষ্ট উন্নতির বিরাট মূর্ত্তি দেখিয়া সমাজ ভয় পাইল, প্রকৃতি রুষ্টা হইলেন, সুতরাং সর্ব্বনিয়ন্তা ঈশ্বরও বিমুখ হইলেন! পর্ব্বতের মূষিক প্রসবের ন্যায় পিউরিট্যানদের এত আড়ম্বর, এত রক্তপাত, এত উগ্র অনুষ্ঠান, সব ব্যর্থ হইয়া গেল!

আমাদের সমাজেও এক্ষণে সেইরূপ উৎপাত আরম্ভ হইয়াছে, সেইরূপ অতিগমনের চিহ্ন সকল দেখা যাইতেছে। এই জন্যই পিউরিট্যান সম্বন্ধীয় কথা এত বাহুল্যরূপে বলিতে বাধ্য হইলাম। আমাদের উন্নতিশীল ভায়াদের এই ইতিহাসখণ্ডকে স্মরণ করিয়া এখনো সাবধান হওয়া উচিত। আমরা উন্নতির বিরোধী নহি—উন্নতির অভিলাষী। কিন্তু আমাদের সমাজকে ছাড়িয়া [illegible], তবে কাহাকে লইয়া উন্নততর রাজ্যে বসতি করিব? সমাজের [illegible] উন্নতি, তাহা যদি অবলম্বন করি, তবে তো সমাজ-দ্রোহী হইলাম—সমাজ আমাকে আর বিশ্বাস করিবে কেন? দেশ, কাল, পাত্র ও অবস্থার তারতম্য বশতঃ এক দেশে এক অবস্থায় যাহা উন্নতি; অন্য দেশে অন্য অবস্থায় তাহা অধোগতিও হওয়া সম্ভব। তাহা বিচার না করিয়া পরের দেখাদেখি উন্মত্ত হইলে কি হইবে? ল্যাপ্‌ল্যাণ্ডের লোক পারিস ও লণ্ডন নগরের দেখাদেখি যদি সুবৃহৎ অশ্ব যানাদি তাহাদের দেশে লইয়া যায়, তবে বরফের উপর সেই গাড়ী ঘোড়া কি চলিতে পারে? না, তদ্দেশীয় বল্‌গা-হরিণের গাড়ী প্যারিস, লণ্ডন ও কলিকাতায় ব্যবহৃত হওয়া সম্ভব?

সামাজিক পরিবর্ত্তনের ধর্ম্ম অতি আশ্চর্য্য। ভাষাই হউক আর লোকাচারই হউক, ইহা কাহারো আজ্ঞায়, কাহারো বিনয়ে, কাহারো অর্থে, কাহারো বল-প্রকাশে কখনই রূপান্তরিত ও অবস্থান্তরিত হইবার নহে। ইহা যখন পরিবর্ত্তিত হয়, (সুদিগে, কুদিগে, যেদিগে হউক) তখনি যে কি কারণে কোথা হইতে কেমন করিয়া ঘটে, তাহার নির্দ্দেশ করা বড় দুরূহ। বড় বড় লোকের বড় বড় উদ্যোগে যেটী সিদ্ধ হয় না, হয় তো অতি সামান্যসূত্রে সামান্য লোকদিগের দ্বারা তাহা সাধিত হইয়া উঠে। হ্যামিল্টন-নামা ইংলণ্ডীয় প্রসিদ্ধ দর্শনশাস্ত্রবিৎ মহাশয় সামাজিক উন্নতি উপলক্ষে এইরূপ ভাব ব্যক্ত করিয়াছেন, যে, "সকলেই জানেন, বীজ অঙ্কুরিত হইয়া প্রতি মুহূর্ত্তেই বাড়িতে থাকে, কিন্তু সমস্ত দিবা রজনী সহস্র নর-চক্ষু প্রহরীরূপে নিযুক্ত থাকিলেও সেই বৃদ্ধি দেখিতে পাইবে না! অর্থাৎ যে চারা কল্য দুই অঙ্গুলি ছিল, অদ্য তাহা চারি অঙ্গুলি হইয়াছে, ইহা মাপিয়া পাইবে; কিন্তু কখন্ কতটুকু করিয়া বাড়িতেছে, তাহা দর্শন করিবার সাধ্য নাই!" অতএব স্বভাবের এই নিয়মানুসারেই সমাজের উন্নতি হওয়া উচিত। তদ্ভিন্ন অন্য

যত উন্নতি, তাহা অস্বাভাবিক, ক্ষণিক অথবা দোষান্বিত! এই জন্মই উন্নতির রূপ-বর্ণনায় মধ্যস্থ পত্রে এইরূপ লেখা হইয়াছিল—

"নব ভাবে মুগ্ধ আঁখি, দেখি যতবার;—
পলকে পলকে রূপ বাড়ে যেন তাঁর!
কেমনে কখন্ বাড়ে দেখিতে না পাই;
রূপের চাতুর্য্য হেন কভু শুনি নাই!"

উন্নতির বিরোধী আমরা নহি—উন্নতি চাই। কিন্তু তাই বলিয়া অস্বাভাবিক উন্নতি চাই না। যে সকল পরিবর্ত্তনের জন্য সমাজ প্রস্তুত হইয়াছে, যাহা আমাদের সমাজের ধাতুতে সংলগ্ন হইতে পারে, তাহাই এক্ষণে হউক। সেগুলি সিদ্ধ হইলে অন্য উন্নতির জন্য সমাজ সহজেই আবার প্রস্তুত হইবে। এখন যাহাকে অস্বাভাবিক বলিতেছি, তখন সেই দ্বিতীয় শ্রেণীর নূতনত্ব অনায়াসেই স্বাভাবিক হইয়া প্রবর্ত্তিত হইতে পারিবে। হিন্দু সমাজের বর্ত্তমান অবস্থা যে প্রকার দাঁড়াইয়াছে, তাহাতে পরিবর্ত্তনোন্মুখ বলিতেই হইবে। যাঁহারা পুরাতনের নিতান্ত ভক্ত, তাঁহাদিগকেও স্বীকার করিতে হইবে, যে, শিক্ষার নূতন প্রণালী, যুক্তির নূতন প্রণালী এবং দৃষ্টান্তের নূতন প্রণালী যাহা বহুবৎসরাবধি হিন্দুসমাজমণ্ডলে আবির্ভূত হইয়াছে, তাহাতে আপনাপনিই আচার ব্যবহারের কিয়দংশ পরিবর্ত্তিত হইয়াছে এবং আর কতকগুলি অংশে পরিবর্ত্তন না হইলে চলে না। সে পরিবর্ত্তন হইবেই হইবে, তাহাকে আটক করিয়া রাখিতে কাহারো সাধ্য নহে! কিন্তু সে পরিবর্ত্তন কোন্ বিষয়ে, কি পরিমাণে কতদূর হইবে, তাহা কে নিরূপণ করিতে পারে? এবং তাহাতে মঙ্গলামঙ্গল কতদূর সাধিত হইবে, তাহা এক্ষণে সিদ্ধান্ত করা দুষ্কর। এই মাত্র অনুমান হইতে পারে, যতদিন সেইরূপ কতকগুলি ভাবান্তর না ঘটিতেছে, ততদিন সমাজের যথার্থ সামাজিকত্বও স্থিররূপে দাঁড়াইতেছে না।

বর্ত্তমান হিন্দুসমাজের যে অবস্থা, তাহা অত্যন্ত শোচনীয়। ইহাকে সমাজ বলি, কি, কি বলি ভাবিয়া নিশ্চয় করিতে পারি না। এই প্রবন্ধের আরম্ভেই সমাজ কাহাকে বলে, তাহা বলা হইয়াছে। আমাদের মধ্যে তাহা কৈ? সমাজের সে সব সর্ব্বজনমান্য নিয়ম কোথায়? এমন স্থান নাই যেখানে প্রাচীন নব্য ও শিক্ষিত অশিক্ষিত এক প্রকার নিয়মে চলিতেছে। এমন

সংসার প্রায় দেখি না, যাহাতে পিতা পুত্রে, মাতা কন্যায়, ভ্রাতায় ভ্রাতায়, স্ত্রী পুরুষে এক ভাবে—এক প্রথায়—এক ব্যবহারে সংসারযাত্রা নির্ব্বাহ করিতেছে! শূদ্রের বাটীতে একটী ব্রাহ্মণ আসিলেন, পিতা প্রণাম করিয়া ভক্তি পূর্ব্বক আসন দিলেন; পুত্র "নন্সেন্স" বলিয়া হাস্য করিয়া চলিয়া গেল! পিতার বন্ধু আগত, পিতা নমস্কার করিলেন; পুত্রের বন্ধু আগত পুত্র "সেক্-হ্যাণ্ড" করিলেন! মাতা সুবচনীর আলিপানা দিতেছেন, কন্যা বা পুত্রবধূ ব্রাহ্মধর্ম্ম পুস্তক পড়িয়া পৌত্তলিকতার প্রতি বীভৎস-রসে গলিয়া যাইতেছেন! কর্ত্তা দশভুজার আরত্রির সময় চামর হস্তে দেবীকে ব্যজন করিতেছেন এবং কর্ত্রী সন্ধিপূজাবসানে ঢাকের বাদ্যের সহিত পুত্র কন্যার কল্যাণে মাথায় ধূনা পোড়াইতেছেন; সেই কালে পুত্র স্বীয় ভগ্নী ও ভার্য্যার সহিত পোষাক পরিয়া ব্রাহ্মমন্দিরে গমন করিতেছেন! স্ত্রী আসনে বসিয়া সন্ধ্যা করিতে-ছেন, স্বামী পাদুকা পায় সমীপবর্ত্তী হইলেন দেখিয়া স্ত্রী সভয়ে বিনীত ভাবে "উঁহুঁ" বলিয়া নিষেধ করিতেছেন। গ্রহণের সময় স্ত্রী তণ্ডুল, বস্ত্রাদি উৎসর্গ করিতেছেন, স্বামী "হো হো" শব্দে হাসিয়া সেই সময় আহার করিতে বসি-তেছেন। গ্রামস্থ বৃদ্ধ মহাশয়েরা "কলিকাল কলিকাল" বলিয়া নব্যতন্ত্রের ব্যবহারে মর্ম্মান্তিক যাতনা প্রকাশ করিতেছেন; নব্যতন্ত্র এ সময়কে "সত্য-যুগ" করিবেন এমত আশা করিতেছেন, কেবল এই কয়জন স্থবিরের গতায়ু হওনের অপেক্ষা!

এরূপ দৃষ্টান্ত কত বলিব? এমন বিসদৃশ, বিরুদ্ধ জনাকীর্ণ জাতিকে কি সমাজ বলা যায়? যত দিন না ইহাদের সামঞ্জস্য হইবে—যতদিন স্বজাতীয় মধ্যে সম্পূর্ণ সমবেদনা ও সহৃদয়তা না জন্মিবে—যতদিন সামাজিকতাকে প্রাণাপেক্ষা রক্ষণীয় বলিয়া আবাল বৃদ্ধ নরনারী সকলের দৃঢ় মমতা ও সক-লের মনেই এক সমাজকে আমাদের সমাজ বলিয়া প্রত্যয় না হইবে, ততদিন হিন্দুসমাজকে যথার্থ সমাজপদে স্থাপিত করা ভার!

বিষয় ভাগ।

সমাজ কি, সামাজিকতা কি এবং হিন্দুসমাজের পূর্ব্বাপর অবস্থাই বা কিরূপ, এতক্ষণ তাহাই সাধারণতঃ বলিলাম ; এক্ষণে সামাজিক আচার ব্যবহারের বিষয় সংক্ষেপে বিবৃত করিতেছি।

বিশদ করিবার জন্য প্রস্তাবটীকে সাতটী পরিচ্ছদে বিভক্ত করা হইল।

১—স্বজাতিধর্ম্ম। ২—সামাজিকতা। ৩—সভ্যতা। ৪—শিষ্টাচার। ৫—বেশভূষা। ৬—উৎসব, ক্রিয়াকর্ম্ম ও সামাজিক দান। ৭—আমোদ আহ্লাদ।

এই সপ্ত প্রকরণের প্রত্যেকের পূর্ব্ব, মধ্য ও বর্ত্তমান অবস্থা দেখা উচিত। কিন্তু যাহা সচরাচর সকলেরি জানা আছে, তাহার বিস্তৃত আলোচনার প্রয়োজন দেখি না। এ ক্ষুদ্র প্রবন্ধে সে সকল মহৎ বিষয়ের বিস্তৃত আলোচনা হওয়াও অসম্ভব। সুতরাং সে সব সংক্ষেপে বলিয়া যে যে বিষয় দেশের বর্ত্তমান অবস্থায় বিশেষরূপে বিচার্য্য, তত্তাবৎ সাধ্যানুসারে একটু বিশদ করিয়া লিখিবার চেষ্টা করা হইতেছে।

প্রথম অধ্যায়।

স্বজাতি-ধর্ম্ম।

হিন্দুজাতির স্বজাতি-ধর্ম্ম বিষয়ের প্রসঙ্গ উত্থাপন মাত্রেই সর্ব্বাগ্রে বর্ণভেদের কথা আসিয়া পড়ে। চাতুর্ব্বর্ণ ও পুরুষানুক্রমিক প্রথাতে বিভিন্ন বর্ণের বিভিন্ন কার্য্য ও ব্যবসায়, যাহা আবহমান নির্দ্দিষ্ট আছে, তাহা কে না জানেন? তথাপি শাস্ত্রীয় উপদেশে, সংহিতার বিধানে এবং পুরাণের বিবরণে এমন প্রমাণ পাওয়া যাইতেছে, যে, এখনকার মত পুরাকালে

বর্ণ-ভেদের এত দৃঢ়বন্ধনী ছিল না; গুণানুসারে ও কর্ম্মানুসারে অধম বর্ণের লোক উত্তম বর্ণে ও শ্রেষ্ঠ বর্ণের মনুষ্য নিকৃষ্ট বর্ণে প্রবিষ্ট কিম্বা গণনীয় হইত। রাজনারায়ণ বাবুর হিন্দুধর্ম্মের শ্রেষ্ঠতা বিষয়ক বক্তৃতায় তাহা সুন্দর রূপে প্রতিপাদিত হইয়াছে। এস্থলে শাস্ত্রের বচন উদ্ধৃত করিয়া দেখানো আবশ্যক। কিন্তু সম্প্রতি উক্ত পুস্তকে সকলেই যখন তাহা দেখিতেছেন, তখন আর প্রস্তাব বাহুল্যের প্রয়োজন কি? মনুসংহিতা ও মহাভারতে স্পষ্ট লেখা আছে, উচ্চনীচ কর্ম্মানুসারে মানবগণ ব্রাহ্মণাদি বর্ণ প্রাপ্ত হন, বংশোদ্ভব হেতুতেই নহে। বেদোল্লিখিত কবস ঋষি এবং পুরাণোক্ত বিশ্বামিত্রই তাহার প্রমাণ। এখনকার হিন্দুরা ব্রাহ্মণের মুখ ভিন্ন পুরাণ কথা শুনেন না, কিন্তু সে কালের ঋষিগণ শূদ্র লোমহর্ষণের নিকট সমুদয় পুরাণ শুনিয়াছিলেন, ইহা স্পষ্টাক্ষরে সেই সব পুরাণেই লিখিত আছে। এই বিষয় সম্বন্ধে প্রাচীন শাস্ত্রের মর্ম্ম তন্ন তন্ন রূপে বিচার করিলে এই অনুমান হইতে পারে, যে, অপেক্ষাকৃত নব্যতর কালে যখন ব্রাহ্মণেরা স্বজাতীয় কঠোর ধর্ম্ম পালনে অশক্ত, অপর বর্ণের ন্যায় বিলাস-সুখাসক্ত এবং তজ্জন্য বেতনগ্রাহী ও বাণিজ্যব্যবসায়ী হইয়া উঠিলেন, তৎকাল হইতেই তাঁহারা পুরুষানুক্রমিক বর্ণভেদের নিয়মটী বিশিষ্টরূপে সুদৃঢ় করিয়া লইলেন। কারণ, তদ্ব্যতীত তাঁহাদের মধ্যে অধিকাংশকেই নিকৃষ্ট বর্ণে যাইতে হইত। ঠাকুরদের ইচ্ছা, "রামও বলিব, কাপড়ও তুলিব!" চাকরীও করিব, মান্যও হইব! বেদের জ্ঞান ও ব্রাহ্মণের আচরণীয় শত শত অনুষ্ঠান, যাহার জন্যই তাঁহারা শ্রেষ্ঠ, সে সব ত্যাগ করিব, কিন্তু শ্রেষ্ঠ পদটী ছাড়িব না! নীচ বর্ণের কর্ম্ম করিব, কিন্তু নীচ বর্ণে যাইব না! সুতরাং ব্রাহ্মণের পুত্র সহস্র কুকর্ম্মী হইলেও তবু তিনি ভূদেব, তবু তিনি পরমপূজ্য, তবু তিনি সেই ব্যাস বশিষ্ঠ, এ শাস্ত্র না করিলে উল্লিখিত রূপে সর্ব্বদিক্ রক্ষা হয় কৈ? যাহা হউক, হিন্দু সমাজে এ বিষয়ের সহিত ধর্ম্মের সম্পূর্ণ সংযোগ, এজন্য ইহার ঔচিত্যানৌচিত্য আমরা কিছুই বলিতে ইচ্ছা করি না। চতুর্দ্দিগে শিক্ষিত সমাজে এই পুরুষানুক্রমিক বর্ণভেদের বিরুদ্ধে যেরূপ অভিযোগ শ্রুত হয়, এবং প্রাচীন-পক্ষ বর্ণ-ভেদের যেরূপ অবিচলিত পক্ষপাতী, তাহাতে নিরপেক্ষ লোকের কথা কওয়াই দায়! বিশেষতঃ যাহারা

ধৰ্ম্ম-বিষয়ের আলোচনায় বিরত, তাহাদিগের পক্ষে ভবিষ্যতের মুখ চাহিয়া প্রতীক্ষা করাই শ্রেয়ঃ। কেবল নিরাপদে দুই পক্ষের পক্ষে ও প্রতিপক্ষে এই দুইটী কথা বলা যাইতে পারে, যে, সভ্যতাভিমানী জাতিরা আপনাদের মধ্যে অভেদ-ভাবের যত জাঁক করেন, কার্য্যে কিন্তু তাহা সংরক্ষিত হয় না। এই প্রবন্ধের প্রথম ভাগে সম্পূর্ণরূপে প্রদর্শিত হইয়াছে, যে, সভ্যতম ইংলণ্ডীয় সমাজেও বর্ণ-ভেদের ন্যায় অথবা কুলীন মৌলিকের ন্যায় লর্ড ও কমন্স শ্রেণী এবং ধনী ও দরিদ্র শ্রেণী আছে; "পিয়ারের" পুত্র সর্ব্বগুণহীন দুঃশীল হইলেও "পিয়ার" উপাধি পাইয়া থাকে। তবে যে নিম্নশ্রেণীর যোগ্য ব্যক্তি রাজ-প্রসাদে উচ্চশ্রেণীতে উঠিতে পারে, এ প্রথাটা অনেক ভাল বটে। আমাদের দেশে সেই নিয়মের অভাবে অনেক অনিষ্ট ঘটে। ফলতঃ এ বিষয়ের পক্ষে ও প্রতিপক্ষে এত তর্ক উত্থিত হওয়া সম্ভব, যে, তদালোচনার জন্য স্বতন্ত্র প্রবন্ধ না লিখিলে চলেনা।

হিন্দুজাতির স্বজাতি ধর্ম্মের দ্বিতীয় অঙ্গ এই, যে, অপর জাতীয় লোককে অর্থাৎ ম্লেচ্ছ যবনাদিকে স্বজাতি মধ্যে গ্রহণ না করা। পূর্ব্বকালে অধম বর্ণ উত্তম হইয়াছে, কিন্তু এটী প্রায় হয় নাই। চণ্ডাল শ্রীরামচন্দ্রের মিত্র হইয়াছে, তাঁহার সহিত কোলাকুলি করিয়াছে, ব্যাধ অজ্ঞানিত রূপে শিবরাত্রি করিয়া মুক্ত হইয়াছে, কিন্তু যবন জাতীয় কেহ প্রায় হিন্দু হইতে পারে নাই। আধুনিক কালে হিন্দু সমাজের এক বর্ণের লোক যখন অপর বর্ণে প্রবেশ করিতে পারে না, তখন ইংরাজ কি মুসলমান যে হিন্দু হইবে, ইহা সম্ভবপর নহে। তবে দরাপখাঁর কাহিনী যাহা শুনা যায়, তাহার সঠিক কোনো বিশেষ সংবাদ নাই। তাহাকে হিন্দুসমাজে পরম ভক্ত বলিয়া মান্য করিত, কিন্তু আহার ব্যবহারে তাহাকে লইয়া চলিত কিনা তাহা আমরা জানি না। নবদ্বীপের চৈতন্যদেব মুসলমানকে বৈষ্ণব করিয়াছেন, এমন কথা শ্রুত হইয়া থাকে, কিন্তু শ্রীযুক্ত রামগতি ন্যায়রত্ন মহাশয়ের সহিত সোমপ্রকাশে জনৈক পত্র-প্রেরকের যে প্রকার বাদানুবাদ হইয়াছিল, তাহাতে নিশ্চিত হইতেছে না, চৈতন্যের সেই সব শিষ্য প্রকৃত হিন্দু কি মুসলমান? যাহা হউক, আ'জ্ কা'ল্ সেরূপে জাতি দিতে পারেন, এমন ক্ষমতাশালী মহিমান্বিত হিন্দু কেহই নাই।

দ্বিতীয় অধ্যায়।

সামাজিকতা।

হিন্দুসমাজের সামাজিকতা বলাতে লোক লৌকিকতা, আহার ব্যবহার, দলাদলি, সামাজিক অপরাধের দণ্ড, এক-ঘরিয়া ও জাত্যন্তর প্রভৃতি নানা বিষয়ের সমষ্টি বুঝিতে হইবে। ইহার প্রত্যেকের পৃথক্ পৃথক্ আলোচনা করিলে অত্যন্ত বিস্তারিত হইয়া পড়ে, এজন্য সামান্যতঃ কতিপয় প্রধান কথার উল্লেখ মাত্র করিব।

সকল জাতি মধ্যে বিনয়, শিষ্টাচার, ভদ্র ব্যবহার প্রভৃতিকে সামাজিকতা বলে। বঙ্গীয় সমাজে ক্রিয়াকাণ্ড উপলক্ষে সামাজিক ব্যক্তিগণকে বসন, ভূষণ, অর্থাদি উপহার প্রদানকেই এক্ষণে সামাজিকতা নাম দেওয়া হয়। ইহা নম্রতা-প্রকাশক মানদায়ক সুন্দর প্রথা। বাটীতে পদার্পণ পূর্ব্বক সকলে আহার করিলেন, তজ্জন্য কর্ম্মকর্ত্তা আপনাকে ধন্য ও কৃতকৃতার্থ জ্ঞানে ভোক্তৃবর্গের গৌরবার্থে মর্য্যাদা দান করেন। নম্রতা-জ্ঞাপন না হইলে ব্রাহ্মণের বাটীতে শূদ্র আহার করিলে মর্য্যাদা পায় না কেন? মর্য্যাদা না পাইয়া বরং ব্রাহ্মণকে প্রণামি কিছু দিয়া আসে। যে সমস্ত দেশে বর্ণভেদ ও অন্ন বিচারের আবশ্যকতা নাই, তত্তদ্দেশে এরূপ সামাজিকতার প্রয়োজনও নাই। কিন্তু অন্ন-বিচারক হিন্দুসমাজে একের সহিত অন্যের ভক্ষ্য ভোজ্য প্রচলিত হওয়া সহজ ব্যাপার নহে। এই জন্য সংস্কার আছে, যাঁহার বাটীতে দশজনে আহার করেন, তাঁহার বিশেষ উপকার করা হয়। সুতরাং এই সামাজিকতাকে এক প্রকার কৃতজ্ঞতার চিহ্ন বলিলেও বলা যায়। যাঁহাদিগকে ঐ সামাজিকতা অর্পিত হয়, তাঁহারা যে মহা সন্তুষ্ট হইবেন, তাহা আর বলিয়া জানাইতে হইবে না। এমতে ইহার দ্বারা উভয় পক্ষেরই তৃপ্তি লাভ হইয়া থাকে। কিন্তু সামাজিকতার অপর একটী মহত্তর ব্যুৎপত্তি যে আছে, যাহাকে স্বদেশানুরাগের সহোদর ভাই বলিয়া ব্যাখ্যা করা সঙ্গত, দুর্ভাগ্যক্রমে বঙ্গীয় সমাজে সে সামাজিকতা যে বিলুপ্ত হইয়া গিয়াছে, তাহা আমরা ইতিপূর্ব্বেই প্রদর্শন করিয়াছি।

সামাজিকতার মধ্যে লিপি-সৌকর্য্যার্থ দলাদলিকেও ধরা গিয়াছে। সকল বিচার্য্য বিষয়ের ন্যায় এ বিষয়েও পক্ষ প্রতিপক্ষ আছে। এ কথা শুনিয়া আমাদের সুশিক্ষিত উন্নতিশীল ভ্রাতারা হয়তো বলিবেন "কি আশ্চর্য্য! এ দেশে ইংরাজি চর্চ্চার বাহুল্য হওনাবধি যে বিষয় শিক্ষিত সমাজে নিতান্ত ঘৃণিত ও সর্ব্বথা পরিত্যজ্য বলিয়া সিদ্ধান্ত হইয়াছে; যে দলাদলিতে নিরবচ্ছিন্ন দোষ ভিন্ন কোনো গুণই নাই; যদ্দ্বারা প্রতিবাসীদের মধ্যে সৌহৃদ্য-ভঙ্গ, দ্বেষ, হিংসা, প্রতিহিংসা, বিবাদ, মনান্তর, খলতা, নিষ্ঠুরতা, ধর্ম্ম-বিরাগ ইত্যাদি সর্ব্বপ্রকার অমানুষিক ও পৈশাচিক কাণ্ড ঘটিয়া থাকে, তাহার আবার বিপক্ষ বৈ পক্ষ কেহ আছে?" কেহ বা বলিবেন "সহস্র শত্রুতা থাকুক, কাহারো বাটীতে নিমন্ত্রণ হইলে আহার করিতে না যাওয়া নিতান্ত কুটিলতা ও নীচতার কর্ম্ম।" ইহা সকলই সত্য, কিন্তু কেবল যদি আহারের বিষয় লইয়া দলাদলি হইত, দল বাঁধিবার অন্য গুরুতর কোনো হেতু না থাকিত, তবে ঐ কথাগুলি সকলই যুক্তিমূলক বলিয়া স্বীকার করিতাম। কিন্তু দলাদলির আরো নিগূঢ় কারণ আছে;—দলাদলির প্রধান অঙ্গ, কোনো দোষী ব্যক্তিকে এক-ঘরিয়া বা শাসন করা। সমাজ মধ্যে যে সকল পাপ অত্যন্ত গুরুতর ও ঘৃণাজনক এবং হিন্দু রাজত্বের অবসানাবধি রাজদ্বারে যে সব অপরাধের বিচার ও দণ্ড হইতে পারে না, সেই সেই দোষের প্রতিফল দেওয়া এবং আর কেহ এমন কর্ম্ম না করে, তদভিপ্রায়ে তদ্দৃষ্টান্ত প্রদর্শন করাই ইহার মুখ্য উদ্দেশ্য। হিন্দু-আচার বিচার আহার ব্যবহার সকলই ধর্ম্ম-মূলক— সকলই ইহ পরকালের শুভাশুভ প্রত্যয়-মূলক। কোনো কোনো বিশেষ অহিতাচার করিয়া কোনো ব্যক্তি পতিত হইলে লোকের বিশ্বাস আছে যে, তাহার সহিত যে আহার ব্যবহার করিবে, সেও পতিত হইবে। সুতরাং ঐরূপ দুষ্কর্ম্মান্বিত ব্যক্তি বা পরিবারকে সমাজে রহিত করা কর্ত্তব্যরূপে গণনীয় হয়। যখন মূল অভিপ্রায় নিন্দনীয় ও নিষ্প্রয়োজনীয় হইতেছে না, তখন দলাদলিকে এককালে পরম দোষাকর ঘৃণ্য পদার্থ ভাবা কি উচিত? ইহাতে সচরাচর দ্বেষ হিংসা, কলহ, কুটিলতা সত্যই ঘটিয়া থাকে, কিন্তু পৃথিবীতে এমন কি আছে, যাহা নিরবচ্ছিন্ন গুণবিশিষ্ট, যাহা নিতান্তই নির্দ্দোষ, যাহা নিতান্তই বিশুদ্ধ, যাহা অমিশ্র উত্তম, যাহা সর্ব্বতোভাবেই

সম্পূর্ণ? ইহাতো সামাজিক প্রথা, যে সকল রাজনৈতিক ব্যবস্থা মহাপ্রাজ্ঞ রাজনীতিজ্ঞ মন্ত্রীবর্গ কর্ত্তৃক বিধিবদ্ধ হইতেছে, তন্মধ্যেও কি পদে পদে দোষ রাশি দৃষ্ট হয় না? নিয়ম-পরিচালক ও নিয়ম-পালক, এই উভয় পক্ষ সাবধান হইয়া না চলিলে সকল সুব্যবস্থাই কুব্যবস্থা হইতে পারে। ফলতঃ যেখানে সমাজ, সেই খানেই মত-ভেদ। যেখানে মত-ভেদ, সেইখানেই দলাদলি। এবং যেখানে সমাজ, সেইখানেই সামাজিকতা-হন্তা দোষী ব্যক্তি। যেখানে এরূপ দোষী, সেইখানেই এরূপ দণ্ড হওয়া স্বাভাবিক। সেই দণ্ডের নাম এক ঘরিয়া হউক, আর দেশ ভেদে যে নামেই অভিহিত হউক, কিন্তু বস্তুতঃ বিষয়টা এক। যে ইংলণ্ডের অনুকরণ করিতে গিয়া ভায়ারা আপনাদের সকল সামাজিক বিষয়েই দোষ দর্শন করেন এবং পূর্ব্ব প্রথা সকল অবচ্ছেদাবচ্ছেদে শীঘ্র শীঘ্র উঠাইয়া দিতে চান, সেই ইংলণ্ড দেশেও কি দলাদলি নাই? সেখানে বরং ইহার ভয়ানক প্রাদুর্ভাব। এ দেশে শাক্ত বৈষ্ণবে যে দলাদলি, সে তো মাধুর্য্য-ভাবময়; সে দেশে রোম্যান ক্যাথলিক ও প্রোটেষ্টাণ্টে যাহা হইয়া গিয়াছে, তাহা পাঠ করিলে মানব প্রকৃতিকে ঘৃণা করিতে ইচ্ছা করে! তৎপরে ইংলিসচর্চ্চ ও প্রেস্‌বিটেরিয়ানের দলাদলি সামান্য লজ্জাকর নহে! রাজকীয় হুইগ ও টরি প্রভৃতির দলাদলিতে অদ্যাপি যেরূপ হিংসা, দ্বেষ, শঠতা, কপটতা, চাতুর্য্য, অবিচার, পক্ষপাত প্রভৃতি পাপাচরণ ইংলণ্ডের বড়-বড় লোক করিয়া থাকেন, তাহার কাছে বঙ্গীয় দলাদলির দোষ সমূহ তো কিছুই নয় বলিলেই হয়! তত্রত্য সেই সব কদর্য্য প্রথা যদি ক্ষমতার ক্ষৌমবাসে মণ্ডিত ও সভ্যতার চাক্‌চিক্যে সুরঞ্জিত না থাকিত, তবে তাহার নিন্দাবাদে পৃথিবী পরিপূর্ণ হইত, সন্দেহ নাই! অধিক কি, আমাদের মধ্যে যে শিক্ষিত যুবকগণ এই দলাদলির ঘৃণাকারী; যাঁহারা দেশের লোককে ঈশ্বরের বিশুদ্ধ উপাসনার পবিত্র পথ দেখাইতেছেন; যাঁহারা ভাবিয়া ও বলিয়াও থাকেন, যে, তাঁহাদের বাক্য শুনিলে ও দৃষ্টান্ত গ্রহণ করিলে লোকে সভ্য ও ধার্ম্মিক হইবে—লোকে সরল হইবে ও দলাদলির কুপ্রথা ত্যাগ করিবে; যাঁহারা স্ত্রী-পুরুষ সমাজে স্বাধীনতা ও ধর্ম্মের ধ্বজা উড়াইয়া একদিনেই পোড়া বঙ্গকে সোণার বিলাত করিয়া তুলিতে উদ্যুক্ত; তাঁহারা নিজেই দলাদলির কৌটিল্য হ্রদে মগ্ন হইয়া মধ্যে কি ঢলাঢলিই বা না করিলেন! তাঁহাদের মধ্যেই যখন

সারল্য, ধৈর্য্য ও সদ্বিবেচনার এত অভাব এবং দ্বেষ হিংসার এত বাড়াবাড়ি, অশিক্ষিত অসভ্য বঙ্গীয় সামাজিকগণ যে তাহা হইতে মুক্তপুরুষ হইবে, এও কি আশা করা যাইতে পারে?

তৃতীয় অধ্যায়।

সভ্যতা।

হিন্দু সমাজকে সভ্যতম ইউরোপীয়েরা অৰ্দ্ধসভ্য বলিয়া থাকেন। উভয় দেশের আধুনিক অবস্থার তুলনায় আমরাও তাহা স্বীকার করি। কিন্তু এককালে এই ভারতবর্ষ প্রায় সর্ব্ববিষয়েই ভূমণ্ডলের সর্ব্বাপেক্ষা সভ্যতম ছিল। কালের কুটিল চক্রে পেষিত হইয়া ইহার সর্ব্বাঙ্গীন উন্নতির অবরোধ হইল, উন্নতি দূরে থাকুক, অবনতি ঘটিয়া উঠিল। এখনো যে ইহা অসভ্য নাম না পাইয়া অৰ্দ্ধসভ্যের শ্রেণীতে অবস্থিত রহিয়াছে, ইহাই সৌভাগ্যের বিষয়। যদি প্রাকৃতিক বিজ্ঞান, ব্যবহারিক বিজ্ঞান, শিল্প বিজ্ঞান, বাণিজ্য বিজ্ঞান, রাজনৈতিক ও অর্থ-ব্যবহারিক শাস্ত্রাদির আলোচনা ও তদনুসারে কার্য্য করা; তৎফলস্বরূপ শক্তি, স্বাস্থ্য, রাজ্য, ঐশ্বর্য্যাদি লাভ করা; মনুষ্যের চিন্তাশক্তি ও লেখনীকে স্বাধীন করিয়া দেওয়া; সামান্য প্রজাকেও ক্ষমতাবান অত্যাচারীর হস্তে রক্ষা করা; ইত্যাদি প্রতিষ্ঠাজনক ব্যাপার সমূহ ধরিয়া সভ্যতার সীমা করা যায়, তবে ইউরোপের তুলনায় অস্মদ্দেশ অৰ্দ্ধ কেন, ষোড়শাংশের একাংশও সভ্য হইতে পারে না। কিন্তু এসমস্ত বিষয় সভ্যতার কেবল মাত্র উপকরণ নহে, ইহার মধ্যে অধিকাংশতো বাহ্য-চিহ্ন। এ সব ব্যতীত আরো বহু বিষয় আছে। তন্মধ্যে ধর্ম্ম ও সামাজিকতা প্রধান বিচার্য্য বিষয়। যতক্ষণ না মনুষ্যের পারিবারিক ও সামাজিক আচার ব্যবহার ধর্ম্মনীতি-সঙ্গত ও উৎকৃষ্ট বৃত্তির অনুমোদিত হয়, ততক্ষণ অন্যান্য উন্নতি সকলই বৃথা। ইউরোপে খ্রীষ্টান ধর্ম্মের প্রসাদে সেই প্রার্থনীয় উন্নতির পথও সম্পূর্ণরূপে মুক্ত আছে।

যদিও তত্রত্য অধিকাংশ সামাজিকগণ আশামত সে পথের পথিক নন, অল্পাংশ তো তাহাতে যথোচিত নিবিষ্ট বটে। এবং সমস্ত ইউরোপের যেমন প্রতাপ, তেমনি দয়া; এই জন্য তাঁহারা এক্ষণে সভ্যতম শ্রেণী হইতে পারিয়াছেন। ভারতবর্ষীয় হিন্দুগণ পরাধীনতা ভুগিয়া ভুগিয়া শিল্প-বিজ্ঞান-জনিত প্রায় সমুদয় বাহ্য উন্নতিতে বঞ্চিত হইয়াছেন, তথাপি তাঁহারা তাঁহাদের আভ্যন্তরিক পূর্ব্বগুণাবলীর অধিকাংশকে অবলম্বন করিয়া আছেন। অনেকে বলেন, হিন্দু জাতি দুই সহস্র বৎসর পূর্ব্বে যাহা ছিল, এখনো তাহাই আছে। যদিও এ কথা সম্পূর্ণ সত্য নহে, যদিও ক্ষুদ্র বৃহৎ অনেক বিষয়ের পরিবর্ত্তন হইয়াছে, কিন্তু সমাজের মূলপ্রকৃতি অদ্যাপি অটুট্ রহিয়াছে। হিন্দুসমাজের মূলপ্রকৃতি ধর্ম্মমূলক। সেই ধর্ম্মাত্মক ধাতুটী সমাজে অদ্যাপি আছে। তাহা আছে বলিয়াই এখনো অর্দ্ধসভ্য নাম পাওয়া যাইতেছে। তাহার পরিবর্ত্তে ইহা যদি বাহ্যসভ্যতামূলক হইত, তবে দুর্দ্দান্ত যবন আক্রমণে কোন্‌কালে সমূলে ধ্বংস প্রাপ্ত হইয়া ঘোর অসভ্যরূপে পৃথিবীর ঘৃণিত পদার্থ হইয়া পড়িত! কিরূপে কাহার দ্বারা কি কারণে আমাদের শাস্ত্রগুলি রক্ষিত হইয়াছে এবং সেই শাস্ত্রানুসারে আচার ব্যবহার চলিতেছে, তাহা আমরা পূর্ব্বে নির্দ্দেশ করিয়াছি। যদি শাস্ত্র ও শাস্ত্রানুযায়ী ব্যবহার না থাকিত, তবে ভাবিয়া দেখুন, আমাদের দশা আর গারোজাতির দশায় কোনো ভিন্ন ভাব লক্ষিত হইত কিনা? সুদ্ধ ধর্ম্মবুদ্ধি, শাস্ত্রীয় জ্ঞান ও আচার ব্যবহার রক্ষা হইয়া আসিতেছে, তাহাও নহে। সেই সঙ্গে শিল্পকর্ম্মেরও ধ্বংসাবশেষ অদ্যাপি দৃষ্ট হইতেছে। হিন্দুভাস্করের কীর্ত্তি দেখিয়া আজো ইউরোপীয়েরাও বিস্ময়াপন্ন হয়! আজো আমাদের কাশ্মীরের শাল, জয়পুর ও কাশী অযোধ্যাদির পাষাণ-কারু; ঢাকার বস্ত্র ও ধাতুকর্ম্ম; কটকের স্থূল যন্ত্রনির্ম্মিত সূক্ষ্মরৌপ্য কাজ ইত্যাদি নিপুণতা বর্ত্তমান রহিয়াছে! আজো জ্যোতিষশাস্ত্রের ভগ্নচিহ্ন-স্বরূপ আশ্চর্য্য জ্যোতিশ্চক্র, আশ্চর্য্য গ্রহণ-গণনা, আশ্চর্য্য চান্দ্র সৌর দিনক্ষণ তিথি নক্ষত্রের নির্দ্দেশ প্রভৃতি কতক প্রকাশমান, কতক বা কীট-চর্ব্বিত, মনুষ্যের করস্পর্শ-বর্জ্জিত তুলট ও ভূর্জ্জপত্রের পুথিমধ্যে অপ্রকাশমান আছে। আজো শারীর-বিদ্যার অদ্ভুত আবিষ্ক্রিয়ার ধ্বংসাবশেষ লইয়া কবিরাজগণ এমন সকল উৎকট পীড়ার উপশম করিতেছেন, যে সকল ব্যাধি সভ্যতম

জাতির চিকিৎসা-শাস্ত্র দ্বারা আরোগ্য হওয়া দুরূহ! আজো হিন্দু-বিজ্ঞানের বিচিত্র পতাকার একটু ছেঁড়া ন্যাকড়া স্বরূপ এই জ্ঞানটুকু আছে, যে, বৈদ্যুতিক পদার্থের সহিত পার্থিব ধাতু পদার্থের আকর্ষণ-সম্বন্ধ জানিতে পারিয়া মেঘ ডাকিলেই স্ত্রীলোকেরা ঘটী বাটী ঘরেব মধ্যে লইয়া যায়।

এই সব আলোচনা করিয়া কোন্ হিন্দুর মন মহা বিমর্ষ না হয়? কাহার হৃদয় এরূপ ঘোর সন্তাপে দগ্ধ হইতে না থাকে যে, "হায়! এত ঊর্দ্ধ হইতে আমাদের এত নিম্নে পতন হইয়াছে? হায়, সেই বীর্য্যবান্, শ্রীমান্, প্রজ্ঞাবান্, কীর্ত্তিমান্, অনুপম দার্শনিক ও সর্ব্বাগ্রগণ্য সভ্য জাতির বংশধর কি আমরা? হায়, এমন কুলে জন্মিয়া আমাদের ভুজবীর্য্য নাই—সে সব গুণের কিছুই নাই।"

আমাদিগের জ্ঞান অতি সংকীর্ণ, কিন্তু অভিমান বিস্তীর্ণ, শিক্ষায় পল্লবগ্রাহী মাত্র, কিন্তু উপদেশের ছটায় দেশ সন্ত্রস্ত। কীর্ত্তির মধ্যে পরের অনুকরণ ও দাস্যবৃত্তি। আমাদের যত কিছু যুক্তি ও দর্শনক্ষমতা "ধুতি পরি, কি পেণ্টলুন পরি" এই রূপ বিষয়াবলীর মহা তর্কেই এখন পর্য্যবসিত হইতেছে। হায়! ইহার অপেক্ষা অধম অবস্থা আর কি হইতে পারে?

চতুর্থ অধ্যায়।

শিষ্টাচার।

এইটী বড় মনস্তাপ, আমাদের নব্যতন্ত্র সুশিক্ষিত হইয়া কোথায় সমাজের মুখোজ্জ্বল করিবেন, না, কথায় কথায় তাহার মুখ পোড়াইতে বসিয়াছেন! যদি কোনো বিষয়ের অভাব থাকে তাঁহারা তাহার পরিপূরণ করুন, আমরা তাহাতে সন্তুষ্ট হইব। যদি কোনো দোষ দৃষ্ট হয়, তাঁহারা তাহার সংশোধন করুন, আমরা তাহাতে আনন্দিত হইব। যদি কোনো অত্যাচার থাকে, (যেমন সতীদাহ, সন্তান ভাসান এবং কন্যা হত্যা পূর্ব্বে ছিল; এবং কোনো কোনো

স্থলে শেষেরটি এখনো আছে) তাঁহারা তাহা নিবারণ করুন, আমরা কৃতজ্ঞ হইব। কিন্তু সে সব করিবার সময় অগ্রে আদ্যন্ত সমুদয় অবস্থা ও তাহার বৈধাবৈধতা যথাবিহিতরূপে বিচারান্তে করিতে হইবে। বিশেষতঃ নবপ্রথার প্রবর্ত্তন বড় কঠিন কাজ, হয় তো ইষ্ট আশে অনিষ্ট ঘটিতে পারে, এই ভয়টী মনে রাখিয়া, অগ্র পশ্চাৎ দেখিয়া সতর্ক হইয়া তাহা করা উচিত। নতুবা সহসা অভাব বোধ, সহসা দোষ দর্শন, সহসা অত্যাচারের অভিযোগ করিয়া উন্মত্ত হওয়া বিধেয় নয়।

এই অধ্যায়ে আমাদের এ কথা বলিবার বিশেষ হেতু আছে। সমস্ত সভ্য বা অর্দ্ধসভ্য সমাজেই ভদ্রতা, লৌকিকতা ও শিষ্টাচারের বিভিন্ন বিভিন্ন প্রথা প্রচলিত আছে। কোনো জাতীয় লোকেই স্বজাতীয় শিষ্টাচার ত্যাগ করিয়া পরকীয় রীতি অবলম্বন করে না। কেনই বা করিবে? কোনো ভদ্রলোক কি আপনার থাকিতে পরের দ্রব্যে স্পৃহা করিয়া থাকে? কি গভীর আক্ষেপের বিষয়, আমাদের নবশিক্ষিত নব্য সম্প্রদায় তাহাও করিতেছেন! শিষ্টাচার ও সৌজন্য প্রদর্শন পদার্থটি হিন্দু সমাজের ভাণ্ডারে এত অশেষবিধ এবং এত অপর্য্যাপ্ত, যে, যত প্রকারের যত চাহিবে ততই প্রাপ্ত হইবে। পাশ্চাত্য ইউরোপীয় গ্রন্থকারেরা যখন কোনো বেশী সৌজন্য, বেশী শিষ্টাচার ও বেশী বিনয়ের কথা উল্লেখ করেন, তখনই এই বলিয়া উপমা দিয়া থাকেন, "এ যেন পূর্ব্বাঞ্চলের সৌজন্য!" (Eastern civility) অথবা, "এ যেন পূর্ব্বাঞ্চলের আড়ম্বর!" (Eastern formality) ইউরোপীয় কোনো পত্রে, কোনো দরখাস্তে কোনো কাগজাদিতে পাঠাপাঠ মোটে নাই। আমাদের দেশের পত্রাদিতে কাজের কথা যদি একটি থাকে, পাঠের শব্দ দশটী পাইবে! অভ্যর্থনা, স্বাগত সম্ভাষণ, নমস্কার, প্রণাম, আলিঙ্গন, পাদ্যার্ঘ, আসনাদি প্রদান, ভক্ষ্য ভোজ্যের বিধান, এ সব পূর্ব্বকালে যাহা ছিল এবং অতঃপর এখনো যাহা আছে, তেমন কি আর কুত্রাপি দৃষ্ট হয়? কাহাকে কিরূপে, কি অঙ্গভঙ্গীতে, কি বলিয়া নতি, প্রণতি, আশীর্ব্বাদ করিতে হয়—কাহাকে নমস্কার বলে, কাহাকে প্রণাম বলে, কাহাকে সম্ভাষণ বলে, কাহার প্রতি কিরূপ শিষ্টাচার বিধেয়, পিতা, মাতা, ভ্রাতা, জ্ঞাতি, কুটুম্ব, পথিক, ভিক্ষুক, ব্রাহ্মণ, শূদ্র, তপস্বী, গৃহী, রাজা, প্রজা, কনিষ্ঠ, জ্যেষ্ঠ ইত্যাদি শত শত সম্পর্কীয় ব্যক্তির

প্রতি পরস্পরে কি কর্ত্তব্য, এত কথা হিন্দুশাস্ত্র ভিন্ন আর কোনো দেশের ব্যবস্থা শাস্ত্রে কি ব্যবস্থাপিত আছে? তদাভাষ দিবার জন্য এস্থলে অন্ততঃ কতিপয় মনুবচন উদ্ধৃত না করিয়া থাকিতে পারিলাম না।

অভিবাদাৎ পরং বিপ্রো জ্যায়াং সমভিদায়ন্।
অসৌ নামাহমস্মীতি স্বয়ং নাম পরিকীর্ত্তয়েৎ॥ ২য়অ, ১২২।

ব্রাহ্মণাদি বর্ণত্রয় যখন বৃদ্ধকে অভিবাদন করিবে, তখন "আমি অমুককে অভিবাদন করিতেছি" বলিয়া আপন নাম উচ্চারণ করিবে।

নামধেয়স্য যে কেচিদভিবাদং ন জানতে।
তান্ প্রতিজ্ঞোঽহমিতি ব্রুয়াৎ স্ত্রিয়ঃ সর্ব্বাস্তথৈবচ॥ ঐ, ১২৩।

যাঁহাকে অভিবাদন করিবে, তিনি যদি সংস্কৃত না জানেন, তাহা হইলে অভিবাদ্যকে অভিবাদনানন্তর 'আমি অভিবাদন করি" এই মাত্র বলিবে এবং স্ত্রীলোকদিগকেও এইরূপ অভিবাদন করিবে।

আয়ুষ্মান্ ভব সৌম্যেতি বাচ্যো বিপ্রোঽভিবাদনে।
অকারশ্চাস্য নাম্নোঽন্তে বাচ্যঃ পূর্ব্বক্ষর প্লুতঃ॥ ঐ, ১২৫।

অভিবাদনানন্তর অভিবাদ্য ব্যক্তি অভিবাদক ব্রাহ্মণাদি বর্ণত্রয়ের মধ্যে ব্রাহ্মণ অভিবাদককে, "হে প্রিয়বর্শন শুভশর্ম্মা তুমি দীর্ঘজীবী হও" ইহা বলিবে; ক্ষত্রিয় অভিবাদককে "আয়ুষ্মান্ ভব সৌম্য বল বর্ম্মন্" এবং বৈশ্য অভিবাদককে "আয়ুষ্মান্ ভব সৌম্য বসুভূতে" এই কথা বলিবে। কিন্তু ব্রাহ্মণ অভিবাদকের নামের অন্তে অথবা অন্ত্যবর্ণের পূর্ব্বে যে অকারাদি স্বর তাহা প্লুতে অর্থাৎ ত্রিমাত্রে উচ্চারিত হইবে; ক্ষত্রিয় ও বৈশ্যের নামের অন্ত্য স্বর অথবা অন্ত্যস্বরের পূর্ব্বস্বর বিকল্পে প্লুত হইবে। শূদ্রের এবং স্ত্রীলোকের নামে প্লুত উচ্চারণ নাই।

পরপত্নী তু যা স্ত্রী স্যাদসম্বন্ধা চযোনিতঃ।
তাং ব্রুয়াদ্ভবতীত্যেবং সুভগে ভগিনীতিচ॥ ২য়, ১২৯।

পরস্ত্রী ও যে নারী পিতৃবংশীয় নহেন, তাঁহাদিগকে ভবতি বা সুভগে অর্থাৎ

ভগিনি বলিয়া সম্বোধন করিবে। ভগিনী প্রভৃতিকে ও পরের অনূঢ়া কন্যাকে আয়ুষ্মতি ইত্যাদি পদে সম্বোধন করিবে।

মাতৃষ্বসা মাতুলানী শ্বশ্রূরথ পিতৃস্বসা।
সংপূজ্যা গুরুপত্নীবৎ সমাপ্তা গুরুভার্য্যয়া॥ ঐ। ১৩১।

মাতৃ-ভগিনী, পিতৃ-ভগিনী, মাতুল-পত্নী ও শ্বশ্রূ ইঁহারা মাতার ন্যায় পূজনীয়া, যেহেতু ইঁহারা গুরুপত্নীর সমান অর্থাৎ মাতার সমান, অতএব ইঁহারা আগত হইলে পাদগ্রহণ পূর্ব্বক অভিবাদন করিবে।

এরূপ কত বিধান আছে, তাহা অনুভবেই বুঝিয়া লইবেন। অধুনা এত সূক্ষ্ম শিষ্টাচার রহিত হইয়াছে, তথাপি অভিবাদন, আলিঙ্গন, আশীর্ব্বচন, প্রিয় সম্ভাষণের কত প্রকার সুপদ্ধতি প্রচলিত আছে, তাহা কে না জানেন? আপনাদের এত থাকিতে—কোনো অভাব না থাকিতেও, তবু আমাদের কেমন কুক্কুর-বৃত্তি অথবা পরের পদ-লেহন প্রবৃত্তির অভ্যাস হইয়াছে, যে, এ সব ভদ্রতা অম্লান বদনে ত্যাগ করিয়া নিতান্ত নির্লজ্জরূপে ইচ্ছাপূর্ব্বক পরকীয় শিষ্টাচার ও দেশাচারের দাস হইয়া উঠিতেছি! যে ব্যক্তি ইংরাজী স্পর্শমাত্র করিয়াছে, সে ব্যক্তিও আলাপী দেখিবা মাত্র মহা ব্যগ্রভাবে সাহেবী ধরণের মুখখানা বক্র করিয়া—

"হ্যালো! হা-ডু-ডু?"

বলিয়া হাত খানি বাড়াইয়া সেক্‌হ্যাণ্ড করিয়া বসে! কিন্তু ইটী ভাবে না, যে, সাহেবদের শ্বেতাননের ভঙ্গিটী কৃষ্ণ বদনে নিতান্ত বিকৃতি দেখায়? আর যে জোরে সাহেবরা সেক্‌হ্যাণ্ড করে, কালো হাতে সে জোর নাই—সে জোর দিতে গেলেও হাত ভাঙ্গিয়া যায়! আমি স্বয়ং এক দিন এক বলবান্ বাবুর সেক্‌হ্যাণ্ডের পাল্লায় পড়িয়া বাড়ী গিয়া চূণ-হলুদ্ দিতে বাধ্য হইয়াছিলাম!

ভাল, অনর্থক এ ধার করা কেন? ইহার আর তো কোনো তাৎপর্য্য দেখি না, কেবল জানানো আর স্পর্দ্ধা করা, যে, আমি ইংরাজী খুব জানি; হেয় বাঙ্গালার চেয়ে আমি বড় বিদ্যা শিখেছি; আমি সাহেবদের সঙ্গে সহবাস করিয়া খুব সভ্য হইয়াছি; নমস্কার, প্রণাম টুণাম সেকেলে ঘৃণিত আচার—নিতান্ত অসভ্যের কার্য্য—ছি!

যাহারা এখনকার বাবুদের ধরণ ধারণ ভালরূপে লক্ষ্য করিয়াছেন, তাঁহারা অবশ্যই দেখিয়াছেন, যে, তাঁহাদিগের সহিত দেখা করিতে গিয়া অথবা হঠাৎ তাঁহাদের দেখা পাইয়া যে দুর্ভাগা তাঁহাদিগকে নমস্কার কি প্রণাম করে, কিম্বা যে দুর্ভাগা ইংরাজীতে কথা না কয়, অন্ততঃ বাঙ্গালার মাঝে মাঝে বড় বড় ইংরাজীর বুকনি না বসায়, তাহার প্রতি বাবুদের অবজ্ঞা হয়, তাহাকে সামান্য লোক ভাবেন, তাহার সহিত যৎসামান্য আলাপ করেন! তাহাকে সেইরূপ নিম্ন-শ্রেণীর জ্ঞান করেন, যেরূপ সাহেবেরা তাঁহাদিগকে জ্ঞান করিয়া থাকেন! আবার যে ব্যক্তি সেক্‌হাণ্ড করিতে জানে, "আঃ! ওঃ! হাঃ! হোঃ! হলো! গুড্ গড্‌সো!" ইত্যাদি বলিতে জানে, মধ্যে মধ্যে টেবিলাঘাতের ন্যায় হাত ফেলিতে জানে, মধ্যে মধ্যে বিনামার গুল্‌ফাঘাতে পদতলে শব্দ করিতে পারে, তায় যদি তাহার বসন ভূষণ কিছু বিলাতি ধরণের হয়, তবে সম্মানের সীমা থাকে না—তাহার সহিত বাবুরা মন প্রাণ খুলিয়া আলাপ করেন, তাহাকে সত্যনিষ্ঠ "ম্যান্ অব্ অনার" বলিয়া ভাবেন, তাহার কাজে অগ্রে মনোভিনিবেশ না করিয়া থাকিতে পারেন না!

শিষ্টাচার ও শিষ্টালাপ প্রথার আনুষঙ্গিক বিস্তর কথা আছে, কিন্তু যথেষ্ট হইয়াছে, একটীর আভাষেই সকলটী বোধগম্য হইবেক।

পুরাকালে হিন্দুসমাজে পিতা, মাতা, আচার্য্য ও গুরু-সম্পর্কীয় ব্যক্তি, পণ্ডিত এবং বয়োধিকের কি প্রকার মান্য ছিল তাহা সকলেই জ্ঞাত আছেন। পূর্ব্বে যে কয়টী বচন সংগৃহীত হইয়াছে, তাহাতেও এ বিষয়ের কিয়দংশ আভাষিত আছে। নমুনাস্বরূপ আরো একটী এস্থলে উদ্ধৃত হইল।

শয্যাসনেঽধ্যাচরিতে শ্রেয়সা ন সমাবিশেৎ।
শয্যাসনস্থশ্চৈবৈনং প্রত্যুত্থায়াভিবাদয়েৎ॥ ২য় অ, ১১৯।

বিদ্যা ও বয়সে অধিক গুরুতর লোক যে শয্যা বা আসন আপন নির্দ্দিষ্টরূপে অধিকার করিয়া তাহাতে শয়ন বা উপবেশন করেন, বিদ্যাহীন বয়ঃকনিষ্ঠ ব্যক্তি কখনো তাহাতে শয়ন বা উপবেশন করিবে না। আর ঐরূপ গুরুলোক সমাগত হইলে শেষোক্ত ব্যক্তি যদি শয্যায় বা আসনে উপবিষ্ট থাকে, তৎক্ষণাৎ প্রত্যুত্থান করিয়া তাঁহাকে অভিবাদন করিবে।

গুরুজন, জ্ঞানী, সম্ভ্রান্ত ও বয়োধিক প্রভৃতির প্রতি এইরূপ অসংখ্য ব্যবস্থা আছে; ওপক্ষে আবার নিকৃষ্টের প্রতি গুরুজনের কর্ত্তব্যনীতিও ঐরূপে ভূয়োভূয়ঃ নির্দ্দেশ করিয়াছেন—তত্তাবৎ কত বলিব? হিন্দুর শিষ্টাচারের ভাণ্ডার অনন্ত। এ সামান্য পুস্তিকা মধ্যে তাহার স্থান কোথায়? হায়, কেন লোকে ইহা বুঝে না? নিজের ভাণ্ডারনিহিত—নিতান্ত-অব্যবহার-মলিন—এই সমস্ত রত্নের প্রতি কেন তাকাইয়া দেখে না? আপনার ধনে হেলা করিয়া কেন পরের ধন ভিক্ষা করিতে যায়? আমি বুড়া হিন্দু, কিছুই বুঝি না—বুঝিতে পারি না। দেখিয়া শুনিয়া হতবুদ্ধি হই, মর্ম্মে ব্যথা লাগে। ব্যথা লাগে বলিয়াই এ বয়সে আবার এত আবোল তাবোল বকিতে বসিয়াছি। আমার এ কথা কেহ শুনিবেন না জানি; জানি কেহ কেহ এ প্রসঙ্গ দেখিয়াই ভ্রুকুটী করিবেন. কেহ বা এ পাতা কয়টা উল্টাইবেন কিনা সন্দেহ; তথাপি যে এত কথা লিখিয়া মরিতেছি কেন, তাহা কি বলিব? বাস্তবিক, বুড়াগুলা সমাজের বড়ই জঞ্জাল, এ গুলার কবে গঙ্গাযাত্রা হইবে!

এই লঘু গুরু জ্ঞান হিন্দু সমাজে কিয়দ্বর্ষ পূর্ব্বেও এত প্রবল, যে, কোনো বর্ব্বরের কথা উঠিলে, এরূপ দৃষ্টান্ত দিবার রীতি ছিল, যে, "যার গুরু লঘু জ্ঞান নাই, তার আবার কথা কি?" এখনো অনেক স্থলে ইংরাজীতে অশিক্ষিত সমাজে এই "গুরু লঘু জ্ঞান" বিদ্যমান আছে, কিন্তু ক্রমেই হ্রাসতাকে প্রাপ্ত হইতেছে। এখন ইংরাজী পড়িয়া আমাদের জ্ঞাণারুণধারী তরুণ মহাশয়দের অনেকেই "স্বাধীনতা" শিক্ষা করিয়াছেন। স্বাধীনতা শব্দটী অনেক বিশেষণের বিশেষ্য হইতে পারে; যথা—

বাক্য বিষয়ক, কর্ম্ম বিষয়ক, ধর্ম্ম বিষয়ক, দাম্পত্য বিষয়ক, ইত্যাদি বহু বিষয়ক স্বাধীনতা। আবার রাজকীয়, আর্থিক, বৈষয়িক, সামাজিক, পারিবারিক স্বাধীনতা আছে। আমাদের যুবকগণ ইহার প্রায় কোনো বিষয়ক বা কোনো বৈষয়িক স্বাধীনতা লাভে সমর্থ নহেন, কেবল ইঁহারা সামাজিক, ধর্ম্মনৈতিক ও পারিবারিক স্বাধীনতা দেখাইতে বিলক্ষণ পটু হইয়াছেন! ইঁহারা রাজ্যশাসনে পরাধীন, অর্থোপার্জ্জনে পরাধীন, সম্মান লাভ বিষয়ে পরাধীন, জ্ঞানার্জ্জনে পরাধীন, সর্ব্ববিষয়ে সর্ব্বত্র অধীনতা ভোগ করিয়া পাড়ায় ও ঘরে আসিয়া এককালে সর্ব্বনেশে স্বাধীন হইয়া বসেন! যে দিবসে এই প্রবন্ধের

প্রথমভাগ পঠিত হয়, সেই অধিবেশনে অত্র সভায় গুণাকর সম্পাদক বাবু দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয় সত্যই বলিয়াছিলেন যে, ইঁহাদের ইংরাজীশিক্ষা-জনিত স্বাধীনতার তেজ কোনো স্থানেই আর খাটাইবার যো পান না, কেবল বাপ মার সঙ্গে পৃথক্ হইয়াই বলেন "আমরা স্বাধীন জীব, স্বাধীন হইলাম!" শুনিলে কর্ণে হাত দিতে হয়, এখন নাকি কেহ কেহ গর্ভধারিণী জননীকে "বাবার পরিবার" বলিয়া থাকেন!

ফলতঃ পূর্ব্বে সকলপ্রকার "ইক্" প্রত্যয়ান্ত বিশেষণ বিশিষ্ট স্বাধীনতার নাম করিয়াছি, কেবল "মর্ম্মান্তিক স্বাধীনতা" শব্দটী বলা হয় নাই—এই পারিবারিক স্বাধীনতাই সেই "মর্ম্মান্তিক স্বাধীনতা!"

হায়! কবে আমাদের যুবকগণ যথার্থ স্বাধীনতার তত্ত্ব অনুধাবন পূর্ব্বক গুরুজনের অধীনতাকে মঙ্গলজনক ভাবিয়া তৎপরিবর্ত্তে রিপু ও স্বেচ্ছাচারের নিকট আপনাদের নবোপার্জ্জিত স্বাধীনতার তেজ দেখাইবেন!

পঞ্চম অধ্যায়।

বেশভূষা।

হিন্দুসমাজে বহু পূর্ব্বকালে সর্ব্বশ্রেণীর স্ত্রীপুরুষের কিরূপ বেশভূষা ছিল,- তাহার সূক্ষ্ম তত্ত্ব নিরূপণ করা দুষ্কর। কোনো বিষয়েরই ইতিহাস নাই, সুতরাং ইহার অনুসন্ধান জন্য কবিদিগের বর্ণনা ভিন্ন অন্য উপায় কি? মল্লধটী, বীরধটী, পিন্ধনবাস, উত্তরীয়, ক্ষৌমবাস ইত্যাদি শব্দে সুদ্ধ কিরূপে অবধারিত হইবে? অঞ্চল শব্দ প্রাচীন কাব্যে দেখা যায়, কিন্তু শাটী কি ঘাগরা কি অন্য কোনো প্রণালীর বস্ত্রাঞ্চল তাহা ঠিক করা সহজ নহে। দ্রৌপদীর বস্ত্রহরণ ব্যাপারে বোধ হয় শাটী বস্ত্র তখন অজ্ঞাত ছিল না; কিন্তু বাঙ্গালীর শাটী হইতে পারে না, কেননা স্পষ্ট লেখা আছে, বিশেষ হেতুবশতঃ তিনি সে দিন একবস্ত্রা ছিলেন। ইহাতে বুঝা যাইতেছে, সেই বিশেষ হেতু ভিন্ন দ্বিবসন বা ত্রিবসন সচবাচর ব্যবহৃত হইত। অপিচ, নলবাজার পরিধেয় বস্ত্র

শনিকর্ত্তৃক অপহৃত হওনের পর মহিষী দময়ন্তীর বসনখানি উভয়ে যুগপৎ পিন্ধন করিতে বাধিত হইলেন। পরে যখন নলরাজা দময়ন্তীকে ছাড়িয়া পলায়ন করেন, তখন সেই বস্ত্রখানির মধ্যভাগ ছিন্ন করিয়া লইয়া যান। ইহাতেও বুঝা যাইতেছে, তখন শাটীবস্ত্র ব্যবহৃত হইত। কিন্তু ঠিক বঙ্গকামিনীর ন্যায় কি অন্যবিধ কিছু হইবে, তাহা নিঃসংশয়ে নিরূপণ করা ভার। কঞ্চুলিক বা কাঁচুলীর আভাস ইহাতেও পাওয়া যাইতেছে, কেননা দময়ন্তীর হৃদয় শূন্য রাখিয়া উভয়ে যে একবস্ত্র পরিধান করিয়াছিলেন, ইহা সম্ভবপর হয় না, এবং অন্যান্য প্রমাণেও কঞ্চুলিকের রীতি এবং ওড়না প্রভৃতির তুল্য দ্বিতীয় ও তৃতীয় বস্ত্রের ব্যবহার একপ্রকার নিঃসন্দেহে প্রতিপন্ন হইতে পারে।

মধ্যকাল হইতে হিন্দুস্থানের নানা স্থানে কয়েকরূপ স্ত্রী-বসন প্রচলিত আছে। কিন্তু সকল প্রণালীতেই দ্বিবস্ত্র অথবা ত্রিবস্ত্র অর্থাৎ হয় শাটী ও কাঁচুলী; নয় ঘাগরা, কাঁচুলী ও চাদর ইত্যাদির ব্যবহার চলিয়া আসিতেছে। *কেবল, তত্তদ্দেশের অধিকাংশ স্থলে স্ত্রীলোকেরা নাভিদেশের নিম্নে বসন আঁটিয়া* স্থূলোদরী যে হয়েন, ইহা অতি কদর্য্য। মহারাষ্ট্রীয় রমণীগণ শাটী পরেন, কিন্তু আমাদের পুরুষশ্রেণীর ন্যায় কাছা দেন, অথচ কোঁচা করেন না। তাঁহাদেরও কাঁচুলী আছে, এমন স্মরণ হইতেছে। কিন্তু ক্রমে এখন শুধরাইতেছেন।

হিন্দুস্থানের পুরুষমণ্ডলীর পিন্ধনবাস অধিকাংশই বীরধটীর ন্যায়। তাঁহাদের জানু হইতে চরণ পর্য্যন্ত কোনো আবরণ দেখা যায় না। যতক্ষণ বাটীতে থাকেন, ততক্ষণ শরীর প্রায় মুক্তই থাকে; অন্যত্র গমন কালে, কার্য্যস্থলে ও সভা মধ্যে অঙ্গাচ্ছাদক বস্ত্র ও শিরে উষ্ণীষ পরিয়া থাকেন। যদিও ইহা বঙ্গবাসীর অপেক্ষা কিয়দংশে শ্রেষ্ঠ, কিন্তু তাঁহাদের সজ্জা বিশেষ রূপে সভ্যতামূলক, শোভাকর ও তৃপ্তিদায়ক বলা যায় না। বিশেষতঃ তাঁহাদের যোষাগণের ন্যায় তাঁহাদেরও নাভিসরোবরে পবনের হিল্লোল লাগিতে দিয়া উদরকে ক্রমে মহা স্ফীত করিয়া তুলেন!

বঙ্গীয় পুরুষগণ পূর্ব্বে পাঁচী ধুতি পরিতেন, (গুণের মধ্যে তাহা স্থূল হইত) উপরের সমস্ত অঙ্গই মুক্ত রাখিতেন; কেবল কোনো স্থানে যাইতে হইলে একখান দোছোট স্কন্ধে ফেলিতেন, শীতকাল হইলে পাছুড়ী বা বনাত বা শাল গায় দিতেন, শাল বনাতের ভিতরে একখানা সূত্র-চাদর ব্যবহার করিতেন।

পায় চটী জুতা, মস্তকে কিছুই না, ফটর ফটর করিয়া কর্ত্তা শ্রাদ্ধ বা বিবাহ-সভায়; হট্টে বা নিমন্ত্রণে; আদালতে বা দলাদলির ঘোঁটে চলিতেন! এইরূপই প্রায় আমাদের পূর্ব্বপুরুষগণের বেশ ছিল।

স্ত্রীলোকেরা বহুকালাবধি একবসনা। কিন্তু পূর্ব্বে স্থূলতর শাটীর অধিক ব্যবহার ছিল। ঢাকাই বা বারাণসী শাটীরও সর্ব্বদা সূক্ষ্মতা-দোষ ছিল না। অলঙ্কারের কথায় আবশ্যক নাই। বস্ত্র লইয়াই যত গোল, তাহারই কথা হউক।

সম্প্রতি এ বিষয়ে যে সমস্ত পরিবর্ত্তন হইয়াছে বা এখনো হইতেছে, তাহা কাহারো অবিদিত নাই। কিয়ৎকাল পূর্ব্ব হইতে বঙ্গীয় পাঁচীধুতি ও স্থূলশাটী প্রায় অব্যবহার্য্য হইয়া গিয়াছে। তৎপরিবর্ত্তে অতি সূক্ষ্ম সূক্ষ্ম পরিসর পরিধেয় উভয় জাতিই পিন্ধন করিতেছেন। মধ্যে দিনকতক আবার শান্তিপুরের সূক্ষ্ম-বুদ্ধি ও সূক্ষ্ম তাঁত হইতে যে সব সূক্ষ্মতম বস্ত্র জন্মগ্রহণ করিত, অনেকে তাহারই পক্ষপাতী হইয়াছিলেন। সে কাপড়ের গুণ এই, পরিলেও জানাযায় না, যে ইনি কাপড় পরিয়াছেন কি দিগ্বসনা আছেন! এক্ষণে কিন্তু তাহার আর অধিক আদর নাই, এখন "মিচির উপর খাপ" ইহাই অনেকে চান্। কিন্তু আমি দুঃসাধ্য কর্ম্মে হাত দিয়াছি; আধুনিক বঙ্গীয় সমাজের বেশ বর্ণনা করে কাহার সাধ্য?

"দেবরাজ দেখে, আর নাগরাজ কয়;"
তথাপি বর্ণনা তার হয় কি না হয়!

কয়েক বৎসরের মধ্যে এত পরিবর্ত্তন, এত নূতন নূতন রকমের প্রবর্ত্তন ও এত বিভিন্ন দেশের অনুকরণ ঘটিয়া উঠিয়াছে যে, যত বৎসরে তাহা হইয়াছে, তত বৎসর ব্যাপিয়া অনুসন্ধান করিলে এবং স্বয়ং বোপদেব আইলেও তাহার অভিধান ও ব্যাকরণ প্রস্তুত হয় কিনা সন্দেহ!

এস্থলে শ্লেষাভাব পরিত্যাগ পূর্ব্বক দুই একটী কাজের কথা বলা আবশ্যক হইতেছে। বঙ্গীয় সমাজে পূর্ব্বাবধি স্ত্রী পুরুষের যেরূপ পিন্ধনবাসের প্রচলন আছে, তাহা পূর্ব্বে যাহা হউক, এখন আর তিষ্ঠিবার যোগ্য নহে। এখন যেরূপ শিক্ষা, যেরূপ মনের গতি, যেরূপ নূতন রুচি জন্মিতেছে, তাহাতে সেরূপ অসভ্যতামূলক অঙ্গাবরণ কিরূপে যুক্তিসঙ্গত হইতে পারে? কেহ কেহ বলিয়া থাকেন এবং ইতিমধ্যে জনৈক প্রসিদ্ধ ডাক্তর মহাশয়ও ব্যক্তি

এমন মত প্রকাশ করিয়াছিলেন যে, উষ্ণদেশে সূক্ষ্ম বস্ত্র ব্যবহারে শরীর সমধিক সুস্থ থাকে। এই মত কতদূর প্রামাণ্য তাহা বলিতে পারি না। কিন্তু বোধহয়, গ্রীষ্মকালে মাঝামাঝি অর্থাৎ নাতিস্থূল নাতিসূক্ষ্ম এবং শীতকালে স্থূলতর, এমন বসনের আবশ্যকতা আছে, যাহাতে এবম্প্রকার নগ্নাবস্থার দোষ না থাকিতে পারে। পুরুষের যে সব ভিন্ন ভিন্ন স্বেচ্ছাচারমূলক বেশ প্রবর্ত্তিত হইতেছে, তাহা প্রার্থনীয় হইতে পারে না। যেহেতু, সামাজিকতা রক্ষণ করিতে হইলে এবং আমাদের একটী সমাজ আছে, এ সংস্কারকে হৃদয়ে ধারণ করিতে হইলে, সর্ব্বপ্রকার আচার ব্যবহারের এমন একটা একতা ও সামঞ্জস্য আবশ্যক করে, যাহাতে করিয়া অপরের চক্ষে ও আপনার চক্ষে হিন্দু সামাজিকগণকে বিভিন্ন সমাজের লোক বলিয়া অনুভূত না হয়। সুতরাং দেহ-সজ্জার বিধান এরূপ হউক, যাহাতে দেখিবামাত্র হিন্দু বলিয়া চিনিতে পারা যায় এবং হিন্দু বলিয়া আপনাদেরও বিশ্বাস থাকে। ইংরেজেরা পেণ্টুলন, জ্যাকেট, কোট পরেন—সকলেই পরেন। টুপি মাথায় দেন, সকলেই দেন। তন্মধ্যে কেহবা শ্বেত, কেহবা নীল, কেহবা পীতবর্ণ ও বিভিন্ন গঠনের জিনিষ ধারণ করেন, তাহাতে হানি কি? মূল-প্রণালী এক হইলেই হইল। সেইরূপে আমরা ধুতি পরিব তো সকলেই পরিব অথবা গৃহে ধুতি, বাহিরে অন্য কিছু, তাহাতেও হানি নাই; কিন্তু একজন সাহেব, একজন মুসলমান, এক জন মোগল, একজন চীন, একজন মগ, এ গণ্ডগোল যেন না হয়! সকলের মনেই এই উদ্দেশ্য যদি জাগরুক থাকে, তবে অল্প কালেই দেখিবেন, অদ্য যে অভিযোগ করিতে হইতেছে, তাহা আর থাকিবেক না। কিন্তু আমাদের কি প্রণালীর সজ্জা হওয়া উচিত, তাহা এস্থলে স্থির করা সঙ্গত হইতে পারে না। তজ্জন্য না হয় প্রধান প্রধান ব্যক্তিবা একটী সভা করুন। হিন্দু সমাজের পূর্ব্বভাব সমর্থন পূর্ব্বক সভ্যতাবর্দ্ধক কোনো নবসজ্জার প্রণালী তাঁহারা মনোনীত করুন। সকলের সাধ্যায়ত্ত হয়, সভ্যতা রয়, অথচ ধনীগণ যতদূর ইচ্ছা ততদূর পর্য্যন্ত সেই প্রণালীতে মূল্যবান বসন পরিধান করিতে পারেন, এমন ব্যবস্থা করা তো দুঃসাধ্য কাজ নয়! প্রার্থনা করি, স্বজাতি-হিতার্থী মহাশয়েরা শীঘ্রই এ বিষয়ের যথোচিত আলোচনায় প্রবৃত্ত হইয়া স্বজাতির একটী বিশেষ অভাব মোচন ও নিতান্ত প্রয়োজনীয় বিষয়ের সংস্কার জন্য চেষ্টা করেন।

ষষ্ঠ অধ্যায়।

উৎসব, ক্রিয়াকর্ম্ম ও সামাজিক দান।

দোল, দুর্গোৎসব, মন্দির প্রতিষ্ঠা, পুষ্করিণ্যাদি উৎসর্গ, তুলা, পুরাণ, শ্রাদ্ধ, অন্নপ্রাশন, শুভ বিবাহাদি সকলই ঐ শিরোনামার অন্তর্গত। তত্তাবতের ধর্ম্ম সম্বন্ধকে আমরা স্পর্শ করিব না। আর্থিক ও সামাজিক অঙ্গই আমাদের বিচার্য্য। ইহার দুই একটী বিষয়ে যাহা মন্তব্য, সকল গুলিতেই তাহা প্রযুজ্য। এই প্রবন্ধের পারিবারিক বিভাগে বিবাহ বিষয়ে অনেক কথা বলা হইযাছে। কিন্তু তাহাতে ব্যয়ের প্রসঙ্গ করা হয় নাই। জ্ঞানী ব্যক্তিরা যখনই এই সব উৎসব কর্ম্মের আলোচনা করেন, তখনই বলিয়া থাকেন এ সকল কাজে সাধ্যাতিরিক্ত ও সম্ভবের বহির্ভূত ব্যয় করা বিধেয় নয়। যশানুরাগে উন্মত্ত হইয়া কত লোক যে এবম্বিধ সৎকর্ম্মের জন্য—এমন কি, একটী মাত্র ক্রিয়া করিয়াও ঋণগ্রস্ত ও নিঃস্ব হইয়া পড়িয়াছেন, কত লোক যে আপনারা চিরজীবন ঐ ঋণাগ্নিতে দগ্ধ হইয়া অবশেষে উত্তরাধিকারীগণকেও সেই জ্বালা ভোগিতে রাখিয়া যান, তাহার সংখ্যা করা যায় না। হিন্দু সামাজিকগণ এ প্রকার ক্রিয়াদি উপলক্ষে এত ব্যয়শীলতা ও এত দাতৃত্ব প্রকাশ করেন, যে, অন্য সভ্যসমাজে তাঁহাদের তুলনা পাওয়া ভার। বিশেষতঃ শ্রাদ্ধ ও বিবাহ কার্য্যে অতি-ব্যয় সর্ব্বদাই হইয়া থাকে। উত্তর পশ্চিমাঞ্চলের লোকে মাতৃ পিতৃকৃত্যে তত অধিক মুক্তহস্ত নন; কিন্তু কন্যার বিবাহে অনেক স্থানের লোকদিগকে এককালে সর্ব্বস্বান্ত হইয়া বসিতে হয়। এইজন্য সূতিকাগারে কন্যাহত্যার ভয়ানক রীতি অনেক স্থলে প্রবর্ত্তিত হইয়া আসিতেছিল, এখন দয়াবান ব্রিটিস গবর্নমেন্টের সাধু চেষ্টায় সেই নৃশংস ব্যবহার প্রায় নিবারিত হইয়াছে। বঙ্গীয় সমাজে কুলীন ব্রাহ্মণ ভিন্ন অন্য বর্ণ মধ্যে কন্যা সম্প্রদান জন্য পূর্ব্বে বড় অধিক দায়গ্রস্ত হইতে হইত না। কায়স্থকুলে মৌলিকের ঘরে কিছু অধিক ব্যয় হইত বটে, কিন্তু তাহা অসম্ভব নয়। কুলীন

কায়স্থদের কুলকরা বা গ্রহণ নামা জ্যেষ্ঠপুত্রের বিবাহ ব্যাপারে যেমন কিছু পণাপণ দিতে হইত, তেমন কনিষ্ঠ পুত্র ও কন্যাগণের বিবাহে পিতা তাহার চতুর্গুণ সুদ সুদ্ধ আদায় করিতে পারিতেন!

এখন সেই কায়স্থকুলে আর কুলীন মৌলিক নাই; বল্লালী কৌলিন্যের অনাদর হইয়া ইউনিভার্সিটীর কৌলিন্যের নব প্রবর্ত্তন হইয়াছে। ঠিকুজী, কোষ্ঠী, মুখ্য, বেড়েমুখ্য, কনিষ্ঠী ইত্যাদি আর দেখা নাই; ছেলে কটা পাস করিয়াছে অগ্রে তাহাই দেখা হইয়া থাকে; এণ্ট্রান্স পাসের দাম রূপার ঘড়া, চুড়ি সুট, মুক্তার মালা এবং হার বাজু আংটী ঘড়ী ইত্যাদি! এল, এ, পাসের দাম রূপার ঘড়া, আধা জড়োয়া আধা সোনা এবং হার, বাজু, আংটী ও ঘড়ী ইত্যাদি! বি, এ, পাসের দাম রূপার ঘড়া, রূপার পিঁড়ী, জড়োয়া গহনা, আংটা ঘড়ী ইত্যাদি! বি, এ বি, এল অথবা এম, এ, বি, এলের দাম ঐ সব ব্যতীত আরো কত কি, তাহা আর কি বলিব! এবং প্রায় সকলের বেলাই হয় নগদ নয় কোম্পানীর কাগজ নয় বাড়ী ইত্যাদি! মধ্যবিধ গৃহস্থের ঘরেই এই ব্যাপার, ধনীর কথা তো ধর্ত্তব্যই নয়! ছেলের বাজারে আ'জ্ কা'ল্ এই চাড়া দরই দাঁড়াইয়াছে, অর্থাৎ "হাই প্রিমিয়ম!" তবে কেঁদে ককিয়ে যাহা কিছু কমান যায়! যাহার মেয়ে হয় তাহার সর্ব্বনাশ; যাহার ছেলে পাস করে, তাহার আর মাটীর পৃথিবীতে পা দিবার আবশ্যক নাই! আবার পাস হয় নাই—ফেল হইয়াছে, কি আরবছর পাস করিবে, এমন ছেলের দরও বড় সামান্যচড়া নয়, ফর্দ্দ ঐরূপই প্রায়, শেষে যা বাদ সাদ হইয়া উঠে!

আমরা অবাক হইয়াছি, যাঁহারা বল্লালী কৌলিন্যের বিরুদ্ধে সভায় বড় বড় বক্তৃতা করেন এবং সংবাদপত্রে বড় বড় প্রস্তাব লেখেন, তাঁহাদের পাস করা ছেলের বিবাহেও ফর্দ্দের এই ঘটা! তাঁহাদের ব্যবহারে এমনি বোধ হয়, যেন ইউনিভার্সিটী-কৌলিন্য আনিবার জন্যই সেকেলে বল্লালী কৌলিন্য তাঁহারা যত্নপূর্ব্বক উঠাইয়া দিতেছেন! ইংরাজী শিক্ষার কি এই ফল হইল? দেশের একটী অনিষ্টকর আচার উঠাইতে গিয়া তদপেক্ষা বিংশতিগুণে পীড়াদায়ক রীতি প্রবর্ত্তিত হইল? ইহাপেক্ষা তো পূর্ব্ব প্রণালী ভাল ছিল, তাহাতে তো কন্যাকর্ত্তার এত ব্যয় হইত না! ক্রমে এ বিষয়ে বঙ্গদেশের দশা উত্তর

পশ্চিমের ন্যায় হইতেছে, তাহা কি সভ্যাভিমানী শিক্ষিতবৃন্দ দেখিতেছেন না? যদি বলেন, তাঁহারা কি করিবেন? তাঁহারা করিবেন না তো কে করিবে? এরূপ বিবাহ কাহার হইয়া থাকে? দূরবর্ত্তী প্রদেশ মধ্যে এখনো তো পূর্ব্বপদ্ধতি অনেক প্রচলিত আছে; যত কিছু বিঘটন, তাহা এই রাজধানী এবং রাজধানী-সন্নিহিত বিশ্ববিদ্যালয়ের উত্তীর্ণ ছাত্রগণের বিবাহেই ঘটিতেছে! তবে আর দেশের ভালোর আশা কাহার নিকট করিব? কন্যা সম্প্রদানের সহিত যথা সর্ব্বস্ব সমর্পণ করিতে হইবে, এই নিষ্ঠুর রীতি হই-তেই ভারতবর্ষ অপত্য-হনন রূপ গুরুপাপে দূষিত হইতেছিল, কোথায় তাহার সংশোধনের জন্য রাজপুরুষদের সহিত অগ্রগামী সভ্য বঙ্গবাসীরা যোগ দিবেন, না, তাঁহাদের নিজের ঘরেই সেই মহা পাপের সূত্রপাত হই-তেছে! শিক্ষা, জ্ঞান এবং মুখের উপদেশের সহিত ব্যবহারের এত অসা-মঞ্জস্য তো শীঘ্র কোনো স্থলে দৃষ্ট হয় না! ইহাতে কি আমাদের নবীন সমাজ-সংস্কারক সাহেবী-সভ্যতার প্রচণ্ড অনুকরণকারীদের লজ্জাবোধ হই-তেছে না? যখন এই প্রথা আরো বাড়িয়া উঠিবে, তখন তাঁহারা কি বলিয়া উত্তর দিবেন? যাহা হউক, এখনো ইহা অপ্রতিবিধেয় হইতে পারে নাই, এখনো সতর্ক হইয়া প্রতিবিধানের চেষ্টা পাওয়া উচিত।

এক্ষণে সামাজিক দানের বিষয় কিঞ্চিৎ বলিব;—সভ্য ইউরোপীয়েরা অভিমান করেন, খ্রীষ্টান ধর্ম্মের ন্যায় দয়া ধর্ম্মের উপদেশ ও অনুষ্ঠান, অন্য ধর্ম্মে নাই। কেহ বা স্পষ্টই বলিয়া থাকেন "হিন্দুদের চ্যারিটী নাই!" কিন্তু সূক্ষ্মরূপে বিবেচনা করিলে হিন্দুশাস্ত্র এবং হিন্দুসমাজ কেবলই দয়ামৃত-মাখা!

দেয়মার্ত্তস্য শয়নং স্থিতশ্রান্তস্য চাসনং।
তৃষিতস্য চ পানীয়ং ক্ষুধিতস্য চ ভোজনং॥

গৃহী ব্যক্তি পীড়িতকে শয্যা, শ্রান্তকে আসন, তৃষিতকে জল ও ক্ষুধিতকে ভোজ্য প্রদান করিবে।

আপনি না খাইয়া ও আপনার জনকে না খাওয়াইয়াও অতিথিকে ভোজ্য দিবার ব্যবস্থা আর কোন্ জাতির ধর্ম্ম শাস্ত্রে আছে?

অতো মিষ্টতরং নান্যৎ পূতং কিঞ্চিচ্ছতক্রতো।
দত্ত্বা যস্ত্বতিথিভ্যোঽন্নং ভুংক্তেতৈনৈব নিত্যশঃ॥

অতিথিদিগকে ভোজন করাইয়া তদবশিষ্ট অন্ন যে ভোজন হয়, তদপেক্ষা পবিত্র ও উপাদেয় অন্ন আর নাই।

অরাবপ্যুচিতং কার্য্যমাতিথ্যং গৃহমাগতে।
ছেত্তুঃ পার্শ্বগতাং ছায়াং নোপসংহরতে দ্রুমঃ॥

শত্রুও যদি গৃহে আসিয়া অতিথি হয়, তাহার সৎকার করা কর্ত্তব্য। বৃক্ষ তাহার ছেদনকর্ত্তার উপরিগত ছায়াকেও হরণ করে না। এমন উপদেশ কতশত স্থানে আছে, তাহার সংখ্যা করা যায় না। স্বদ্ধ কি তাই? পশু পক্ষী কীট পতঙ্গকেও সমভাবে দয়া করিতে হিন্দুশাস্ত্রে ভুয়োভূয়ঃ উপদেশ করিয়াছেন। শ্রাদ্ধকালে অগ্রে পুত্র-পুত্রী-জ্ঞাতি-বন্ধু-হীন অগ্নিদগ্ধা কোথাকার কে, তাদের পিণ্ড না দিয়া যাহারা আপনাদের বাপ মাকে পিণ্ড দান করে না, তাদের দয়ার কি তুলনা আছে?

খ্রীষ্টান সমাজের অধিকাংশ দানের কাজ সভাবিশেষ কর্ত্তৃক দাতাগণের নিকট চাঁদা সংগ্রহ পূর্ব্বক হইয়া থাকে; হিন্দুসমাজে ভূরিদান-কার্য্য শ্রাদ্ধাদি ক্রিয়ার উপলক্ষে ধর্ম্মানুষ্ঠানযোগে আবহমান সাধিত হইয়া আসিতেছে। ইহার কোন্‌টী ভাল, কোন্‌টী মন্দ, এস্থলে তাহার বিচার করিতেছি না। অল্প কথায় তাহার সূক্ষ্ম বিচার হইতেও পারে না। যে সমাজের আকৃতি প্রকৃতি গঠন যেরূপ, কার্য্যানুষ্ঠানের রীতি পদ্ধতিও তদনুরূপ হইয়া থাকে। ইউরোপীয় লোকের আচার ব্যবহার, ইউরোপীয় দাতার ধর্ম্ম বুদ্ধি এবং ইউরোপীয় ভিক্ষুর স্বভাব ও অভাব যেরূপ, অভাব নিবারক দানের প্রথাও তদুপযোগী হইয়াছে। এ দেশের সমুদয় কার্য্যই ধর্ম্ম-মূলক; আবার প্রত্যেক ধর্ম্ম-মূলক কার্য্যের প্রথমেই দান; প্রতি গৃহস্থ প্রতিদিন দান না করিয়া থাকিতে পারে না—যাহার কিছুই নাই, সে মুষ্টিভিক্ষাও দিবে, না হয় গোরুকেও গোকল দিবে; এ সকলের কিছুই না পারে তো নিদান তুলসী গাছেও জলদান করিবে! সুতরাং চান্দার প্রথা না থাকিলেও দানের ক্রটী নাই।

চাঁদায় দেশের কয়জন স্বাক্ষর করে? শত বৎসর শত সভার দ্বারা যত লোকের অভাব নিবারিত হওয়া সম্ভব, হিন্দু সামাজিক দান দ্বারা এক বৎসরে তাহারও অধিক লোক প্রতিপালিত হইতেছে। এ কথা হঠাৎ শুনিতে অত্যুক্তিবৎ বোধ হইতে পারে, কিন্তু যাঁহারা হিন্দু সমাজের আভ্যন্তরিক কার্য্যপ্রণালী ও অসংখ্যপ্রকার দানের সোপান চিন্তা করিয়া থাকেন, তাঁহারা কখনই ইহাকে অতি-বর্ণনা ভাবিবেন না; বরং ন্যূন-বর্ণনাই বলিবেন!

যদি বল, দানের পাত্র বাছনি হয় না, দীন দুঃখীর অপেক্ষা ব্রাহ্মণগণকেই অধিক দেওয়া হয়। তদুত্তরে নিবেদন, অকারণ যে সেই দানের ব্যবস্থা হইয়াছে তাহা নহে। যখন বর্ণ বিভাগ অনুসারে কার্য্য বিভাগ নিরূপিত ছিল, তখন হিন্দুরাজত্বে অন্যান্য বর্ণের লোকেরা যে নিতান্ত দুঃস্থ হইবে তাহার সম্ভাবনা অল্প। এদেশের দাতাগণের সংস্কারানুসারে দানের পাত্র তিন প্রকার। যথা;—

যাঁহারা ধর্ম্মের জন্য সংসার-ত্যাগী; যাঁহারা হীনাঙ্গ ও হীনাবস্থ; এবং যাঁহারা জ্ঞান ও ধর্ম্মরক্ষক।

প্রথম শ্রেণী অর্থাৎ যাঁহারা ধর্ম্মের জন্য অসাধারণ ত্যাগ স্বীকার করিতে পারেন, তাঁহাদিগকে সামান্য ব্যক্তি বলা যায় না। তাঁহারা সাধু, প্রাণধারণোপযুক্ত যৎকিঞ্চিৎ অন্নপান ভিন্ন তাঁহারা আর কিছুই চান না। সেই অন্ন গৃহস্থ না দিলে তাঁহারা কোথায় পাইবেন? কাজেকাজেই হিন্দুর সংস্কার, যে এমন সাধুকে অন্নাদি দান করা গৃহস্থের পরম ধর্ম্ম। এইজন্য যতি, ব্রহ্মচারী, দণ্ডী, সন্ন্যাসী প্রভৃতি উদাসীনের এত গৌরব। এখনকার ভণ্ড তপস্বীদের দেখিয়া যাঁহারা এ বিষয়ে অবজ্ঞা প্রদর্শন করেন, তাঁহাদের বিষম ভ্রান্তি!

দ্বিতীয় শ্রেণীর লোক এপ্রকার ঈশ্বরপরায়ণ নহে, তাহারা সর্ব্বধর্ম্ম মতে যথার্থই ঈশ্বরের জীব! তাহারা সর্ব্বদেশস্থ গৃহস্থের যথার্থই দয়ার যোগ্য পাত্র! অন্ধ, খঞ্জ, কাণ, বধিরাদি বিকলেন্দ্রিয়, উৎকট ব্যাধিগ্রস্ত এবং নির্ব্বান্ধব, নিঃসহায়, নিরাশ্রয়, নির্ধন, নির্ভূম, দীনদরিদ্র অনাথগণ লইয়াই এই শ্রেণী। সমাজের সম্পত্তি-বিভাগ-রহস্য এমনি আশ্চর্য্য যে, অল্প সংখ্যক মনুষ্য অন্নোপরি অন্ন, বস্ত্রোপরি বস্ত্র, সুভোজ্যোপরি সুভোজ্য, আবার উদ্বৃত্ত অর্থে মণি মুক্তা যান বাহনোপরি অসীম ঐশ্বর্য্যভোগী।

কিয়দংশ লোক কোনো মতে গ্রাসাচ্ছাদন নির্ব্বাহে সক্ষম; এবং অবশিষ্ট মনুষ্য তল্লাভেও বঞ্চিত্! এই শেষোক্ত লোকেরা পূর্ব্বোক্ত সমর্থ ভ্রাতাগণের ভুক্তাতিরিক্ত বস্তুর অংশ অবশ্যই পাইতে পারে। কিন্তু সে পাওয়া বলপূর্ব্বক নয়, দায়াদের ন্যায় রাজকীয় ধর্ম্মাধিকরণ হইতেও নয়—সেই অংশদাতাদের দয়া নামক ধর্ম্মাধিকরণে আর্দ্দাশ করিয়াই পাইয়া থাকে!

তৃতীয় শ্রেণী না উদাসীন, না অন্ধ, না অনাথ, তাঁহারাও নিজে গৃহস্থ ও নিজে প্রধান সামাজিক। সমাজের গুরুতর কার্য্য-ভার তাঁহাদের উপর অর্পিত। সেই গুরুভার বহন জন্য—সেই কাজ করেন বলিয়াই সমাজের নিকট কর্ম্মের বেতন স্বরূপ—গুণের পুরস্কার স্বরূপ সামাজিক দান-প্রাপ্তির অধিকারটী লাভ করিয়াছেন! ব্রাহ্মণ, আচার্য্য, ঘটক ও ভট্ট প্রভৃতি জাতিরাই এই শ্রেণী-নির্বিষ্ট। তন্মধ্যে যজন, পূজন, স্বস্ত্যয়ন, অধ্যয়ন, অধ্যাপনা, ব্যবস্থাদান, শাস্ত্ররক্ষা এবং ধর্ম্মের প্রহরিতা করেন বলিয়া ব্রাহ্মণ জাতি সর্ব্বোচ্চরূপে পূজ্য ও শ্রেষ্ঠদানাস্পদ হইয়া আসিতেছেন।

বোধহয়, শাস্ত্রকারেরা এতন্মর্ম্মেই প্রচলিত দানের ব্যবস্থা করিয়া দিয়াছেন। সে ব্যবস্থা এত সুন্দর, যে, চাহিতে হয় না, জোর করিতে হয় না, চান্দা সংগ্রহের কষ্ট লইতে হয় না, সভা বক্তৃতাদির প্রয়োজন করেনা, অথচ ঐ তিন শ্রেণীর লক্ষ লক্ষ আশান্বিত লোক প্রত্যহ দানের উপর নির্ভর করিয়াই জীবন যাত্রা নির্ব্বাহ করিতেছে! তুলনা করিয়া দেখুন, এমন সামাজিক দানের কৌশল কি কুত্রাপি আর দৃষ্ট হইয়া থাকে? দাতা ও দান সর্ব্বদেশেই আছে, কিন্তু অবলীলাক্রমে এতলোক প্রতিপালিত হওয়ার প্রথা আর কোনো সমাজে প্রচলিত নাই! ইহার সুচারু কৌশলের বিষয় যতই চিন্তা করা যায়, ততই মুগ্ধ হইতে হয়। অতিশয় দুশ্চরিত্র এবং নিতান্ত নিষ্ঠুর নরাধম ব্যক্তিরাও হিন্দুসমাজে কথনো না কথনো, কিছু না কিছু দান না করিয়া বাঁচিতে পারে না। এই সামাজিক প্রণালীতে অত্যন্ত ব্যয়কুণ্ঠ ব্যক্তিকেও সময় বিশেষে মুক্ত-হস্ত হইতে হয়। সহস্র অনুরোধে যাহার নিকট একপয়সা চান্দা বাহির করা ভার, তাহাকেও পিতৃমাতৃ শ্রাদ্ধাদিতে এই কৌশল-ফাঁদে পড়িয়া হঠাৎ দাতা হইতে হয়! সকল কর্ম্মেই দান ও ভোজ, এবড় সাধারণ কথা নহে। সর্ব্বাপেক্ষা আবার অধ্যাপক বিদায়ের রীতিটী যে কি যশস্কর, উপাদেয় ও

উপকারক প্রথা, তাহা এই বহু-বিষয়িনী বক্তৃতা মধ্যে সম্পূর্ণরূপে বিবৃত হওয়া সম্ভবে না।

কিন্তু যে যে উদ্দেশে উপর্য্যুক্ত তিন শ্রেণীর লোক আবহমান সামাজিক দান-বৃত্তি ভোগ করিয়া আসিতেছে, এক্ষণে তাহাতে অনেক দোষ স্পর্শ হইয়াছে। উদাসীন ও ত্যাগ-স্বীকারকারী সাধুশ্রেণীর মধ্যে অসংখ্য ভাক্ত দুর্ব্বৃত্ত প্রবেশ করিয়াছে এবং অধ্যাপকের টিকি ও ফোঁটা-চিহ্ন ধারণ করিয়া অধ্যাপকের বংশজাত বলিয়া ও উপরোধ অনুরোধের যোগাযোগ করিয়া অনেক বর্ণজ্ঞানহীন ব্রাহ্মণ অধ্যাপকের বিদায় পাইতেছে। তাহাতে সমাজের বিশেষ হানি হইতেছে। দেশমধ্যে যথার্থ উদাসীন, যথার্থ অন্ধ আতুর নিরাশ্রয় এবং যথার্থ অধ্যাপক মণ্ডলীকে দান দিতে ক্রিয়াকর্ত্তা মাত্রেরই ইচ্ছা ও শ্রদ্ধা হইতে পারে। ছদ্মবেশীকে দিতে শ্রদ্ধার বৈপরীত্যে বরং বৈরক্তিই হইয়া থাকে। এমন কি, দেখা গিয়াছে, ঐ ভাক্তশ্রেণীর দৌরাত্ম্য-ভয়ে, সাধ্য ও ইচ্ছা সত্ত্বেও অনেকে অধ্যাপক নিমন্ত্রণ করিতে সাহসী হইতে পারেন না। ফলতঃ যথার্থ অধ্যাপকের সংখ্যা কয়জন? যদ্যপি সেই কয়জন মাত্রকে দিলেই হইত, তবে যত বাড়ীতে যত কর্ম্মে এখন অধ্যাপক বলা হইয়া থাকে, অন্ততঃ তাহার চতুর্গুণ বেশীলোকের বাটীতে অনায়াসে অধ্যাপকের নিমন্ত্রণ হইতে পারে। এমতে ব্যয়ের সার্থকতা, কর্ম্মকর্ত্তার তৃপ্তি এবং পণ্ডিতবর্গের সমুচিত সাহায্য হইয়া সর্ব্বদিগেই বিস্তর উপকার সাধিত হয়।

তাঁহাদিগকে দেওয়া সুদ্ধ যে দয়া ভাবিয়া—সুদ্ধ যে ব্রাহ্মণ ও বিদ্বান বলিয়া তাহাও নহে। তদ্ব্যতীত আর একটী গুরুতর বিবেচনা আছে; ইতিপূর্ব্বে তাঁহাদের চতুষ্পাটীই অন্ধতমসাচ্ছন্ন বঙ্গভূমির একমাত্র উজ্জ্বল আলোকাধার ছিল এবং এখনো অল্প পরিমাণে আছে। যখন যবন প্লাবনে দেশ মূর্খতা ও পাপতরঙ্গে নিমগ্ন হইয়া গেল—চারিদিগেই অনভিজ্ঞতারূপ অকূল সমুদ্র, সেই কালে সেই অকূলমধ্যে সব ডুবিল, কেবল একটী উচ্চ স্থান ঠিক যেন সিন্ধু শৈলবৎ মস্তক উন্নত করিয়া রহিয়াছিল। সে শৈলের নাম "টোল!" ভীষণ অর্ণব মধ্যে যেখানে যেখানে গুপ্তচর ও গুপ্তপাষাণ থাকে, ইংরাজেরা সেখানে সেখানে আলোস্তম্ভ অর্থাৎ "লাইট্ হাউস্" নির্ম্মাণ করিয়া এক একজন প্রহরী নিযুক্ত রাখেন। সেই প্রহরী যেমন জনপদের সকল সুখ

ত্যাগ পূর্ব্বক·বণিকদের উপকারার্থ আপন প্রাণ হাতে করিয়া স্তম্ভের শেখর দেশে প্রত্যহ আলো জ্বালিয়া পোতবাহীগণকে বিপদ স্থানের নির্দ্দেশ করিয়া দেয়, বঙ্গ দেশের তাৎকালিক মূর্খতা ও পাপ-সিন্ধুর মধ্যে সেইরূপে কয়েক থানি চতুষ্পাটী সেই লাইট্ হাউসের কাজ করিয়াছে এবং কষ্ট-সহিষ্ণু ভট্টাচার্য্য মহাশয়েরা তাহার আলোকধারী প্রহরীরূপে আপনা হইতেই নিযুক্ত ছিলেন! অতএব আধুনিক বাবুদের ঘৃণ্য আতপতণ্ডুল-নিরামিষাশী কাঁচকলা-ভোক্তা রোগা ব্রাহ্মণ কয়জন ভারতের নির্ব্বাণোন্মুখ জ্ঞান-দীপ জ্বালিয়া রাখিয়াছিলেন বলিয়াই ঘোর বন্যতারূপ দুর্দ্দশার হস্তে বঙ্গীয় সমাজের প্রাণটা বাঁচিয়া রহিয়াছে! আবার প্রসঙ্গতঃ ইহাও বলিতে হয়, যে, যে গুরু মহাশয়-দের পাঠশালা বাবুদের চক্ষুশূল, তাহাও বঙ্গদেশে ক্ষুদ্র লাইট্ হাউসের কাজ করিতে ক্রটী করে নাই! দেওয়ান বল, মুন্সী বল, কার্কুন বল, জমীদার বল, রাজা উজীর যাই বল, বাঙ্গালীরা বাদশা ও নবাবদের আমলে যিনি যত বড় হইয়াছিলেন এবং চল্লিশ পঞ্চাশ বৎসর পূর্ব্বে ইংরাজাধীনে যত উচ্চ পদের কাজ করিয়াছিলেন, সব সেই গুরু পাঠশালার ছাত্র! সে শিক্ষাকে যাঁহারা এখন ঘৃণা করেন, তাঁহাদের ভাবা উচিত, সেই অশুদ্ধ বর্ণমালা ও শুভঙ্করের সঙ্কেতাবলী গুরু মহাশয়েরা রাখিয়াছিলেন বলিয়াই সেই মূল পত্তনের উপরে অধুনা এত বড় বাঙ্গালা ভাষার পুরী নির্ম্মিত হইতেছে! সেই গুরু-শিক্ষার প্রণালীতে অন্ততঃ একটী গুণ এই ছিল, যে, লোকে বৈষয়িক ব্যাপারে বিলক্ষণ চতুরতা দেখাইতে পারিত। এখনকার স্কুলের বাবুরা বাজার করিতে গেলে বিক্রেতার মূল্য দিবার সময় যেমন শ্লেট পেন্সিল লইয়া ত্রৈরাশিক কসিতে বসেন, অন্ততঃ তখন সে দুর্দ্দশা ছিল না!!

আধুনিক অর্দ্ধশিক্ষিত নব্যগণ অকারণে বিচার না করিয়াই পূর্ব্ব সমাজের সকল বিষয়ের প্রতি বিদ্বেষ-বুদ্ধি-পরায়ণ, এই দুঃখে জানিয়া শুনিয়া প্রসঙ্গতঃ অপ্রাসঙ্গিক গুরু মহাশয়দের কথা তুলিলাম। নতুবা চতুষ্পাঠীর ভট্টাচার্য্য মহাশয়দের বিষয় উল্লেখ করাই আমার মূল অভিপ্রায়। ফলতঃ যাঁহারা সমা-জের এত হিতকারী, যাঁহারা স্বীয় স্বীয় ব্রাহ্মণীগণকে সারাদিন রন্ধনশালায় ভয়ানক কষ্ট (এখনকার মতে কষ্ট!) দিয়া এবং আত্ম-ব্যয়ে খাওয়াইয়া বিদ্যার্থী মাত্রকেই যত্ন পূর্ব্বক রক্ষণ ও শিক্ষা দান করেন, তাঁহাদের অপরিশোধ্য ঋণের

ক্ষিয়দংশ শোধিবার জন্যই এই সকল সামাজিক দানের প্রথা প্রচলিত আছে। তাহাতে বিঘ্ন ঘটিলে বড় দুঃখের বিষয়। অতএব বিজ্ঞমণ্ডলী ইহার দোষোদ্ধার ও সুব্যবস্থা করেন, ইহা আমাদের ঐকান্তিক প্রার্থনা!

দানের কথা হইল, এই সঙ্গে ভোজের কথাও কিছু হওয়া উচিত। কিন্তু প্রস্তাব দীর্ঘ হইয়া উঠিয়াছে। বৈরক্তি উৎপাদনের আশঙ্কায় আর বাহুল্য বলিতে পারি না। একত্র বহু লোকের পংক্তি ভোজন, কদলীপত্র ভোজনপাত্র এবং প্রাঙ্গণভূমি স্থান, ইহার জন্য নব্য সভ্যগণ কিছু চটা আছেন, তজ্জন্য কিছু বলিবার আবশ্যক ছিল। কিন্তু যে প্রণালীতে ও যে প্রকরণে তাঁহাদের অন্যান্য বিষয়ক বীভৎসরোগের শান্তি চেষ্টা হইল, ইহাতেও কিঞ্চিৎ মুষ্টিযোগ সহকারে সেই প্রণালী, সেই প্রকরণ ও সেই অনুপান প্রয়োগ করিলেই যথেষ্ট হইবেক—সুতরাং আর বিশেষ করিয়া বলা বাড়ার ভাগ!

সপ্তম অধ্যায়।

আমোদ আহ্লাদ।

একথা সকলেই জানেন যে, যতপ্রকার নির্দোষ আমোদ আছে, তন্মধ্যে সঙ্গীতই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ। অনুমান হয়, মানব সমাজের আদ্যাবস্থা হইতেই নৃত্যগীতের আমোদ আছে এবং তৎপরে যাত্রাদির সৃষ্টি হইয়া থাকিবেক। জগদীশ্বর প্রিয়পুত্র মনুষ্যের আনন্দ বিধান জন্য সুদ্ধ পক্ষীকণ্ঠে সুস্বর দিয়াই ক্ষান্ত হয়েন নাই, তাহার নিজ কণ্ঠেও আশ্চর্য্য স্বর-শক্তি দান করিয়াছেন এবং নানা নির্জীব পদার্থের সংযোগে অদ্ভুত সুস্বরের উৎপাদনে তাহাকে সমর্থ করিয়া কত দয়াই প্রকাশ করিয়াছেন! আহ্লাদের সময় অনেক ইতর প্রাণীও নৃত্য করিয়া থাকে, মনুষ্য তো করিবেই।

তৌর্য্যত্রিক সঙ্গীতামোদ সকল জাতিতেই আছে, কিন্তু এদেশে ইহার যত ঔৎকর্ষ সাধিত হইয়াছিল, অদ্যাপি কুত্রাপি তেমন দেখা যায় না। কৈলাসনাথ মহেশ্বর ও দেবর্ষি নারদ হইতে মিয়া তান্‌সানের সময়ের পর পর্য্যন্ত এবিষয়ের

কত লিখিত পঠিত, কত জনপ্রবাদ ও কত দৃষ্টান্তই শ্রুত হইয়াথাকে! অতি অল্প কাল পূর্ব্বেও ইহার আধিক্য ও পারিপাট্য চমৎকার ছিল। আ'জ্ কা'ল্ ভারতের সকল সুসভ্যতার সহিত ইহারও হ্রাসতা ঘটিয়া উঠিয়াছে! তথাপি "প'ড়ে মরে বঙ্গের রাজা!" এখনো—এই হীনাবস্থার দিনেও অন্যান্যবিষয়ে সভ্যতর জাতিরা আমাদের শ্রেষ্ঠ হইয়াও এ বিষয়ে কিয়দংশে নিকৃষ্ট আছেন!

হিন্দু সামাজিক আমোদ আহ্লাদের পরিচ্ছেদে সঙ্গীতের আলোচনায় দুইটী কথা সহজেই আসিয়া উদিত হয়। একটী, গুরুলোকের সাক্ষাতে সঙ্গীতের প্রয়োগ। দ্বিতীয়টী, অন্তঃপুরে সঙ্গীতের আলোচনা। এই দুইটীই ইউরোপীয় সভ্য সমাজে প্রচলিত আছে। হিন্দুদিগের জ্যেষ্ঠ-কনিষ্ঠ গুরু-লঘু-ভাব সেদেশে নাই এবং স্ত্রী-স্বাধীনতার প্রথাটী অত্যন্ত প্রবল, এইজন্যই তাঁহাদের সমাজে তাহা উত্তমরূপে খাটিয়াছে। আমাদের সমাজে পিতা, জ্যেষ্ঠতাত, খুল্লতাত, জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা, প্রভৃতি গুরুতর সম্পর্কীয় এবং বয়োধিক ব্যক্তি মাত্রকেই মান্য করিবার রীতি বিলক্ষণ প্রচলিত আছে। এমন কি, গুরুলোকের সহিত সমানভাবে ঘাড় তুলিয়া ঔদ্ধত্যভাবে কথা কওয়া হিন্দু-সমাজে দোষের বিষয়, সুতরাং তাঁহাদের সমক্ষে গীত-বাদ্য-প্রয়োগরূপ ঔদ্ধত্য প্রকাশ করা সঙ্গত হইতে পারে না। সমাজের ধাতু সর্ব্বত্র সমান নয়; সেই কারণে সামাজিক শিষ্টাচারের রীতিতেও প্রভেদ দৃষ্ট হয়। কোনো কোনো দেশে যুবকগণের স্বাধীনতা প্রকাশ লোকের চক্ষে নিন্দিত বলিয়া গণ্য হয় না। কেননা, সেই সেই দেশে যুবতীর স্বাধীনতাই যখন অনুমোদনীয়, তখন যুবকের পক্ষে তাহা তো সামান্য কথা! এদেশে স্ত্রীলোকের স্বাধীনতা নাই, অর্থাৎ যেখানে সেখানে যাহার তাহার সহিত যাওয়া এবং পরম-স্নেহবান্ পিতা, ভর্ত্তা, পুত্র প্রভৃতির পরম মঙ্গলময় বশ্যতা-গণ্ডীর বাহিরে যাওয়ার রীতি নাই, এবং অপর পুরুষগণেরও অন্তঃপুর-যাতায়াতের প্রথা নাই, সুতরাং স্ত্রীলোকের গীতবাদ্য-শিক্ষার উপায়াভাব। ইহা তো সামান্য একটী কারণ; বিশেষ অন্তরায় আরো আছে। সত্য বটে, বহু পূর্ব্বকালে বড় বড় রাজ-পরিবারে সঙ্গীতের চর্চ্চার কথা কাব্যশাস্ত্রে ও পুরাণে পাওয়া যায় এবং এখন উত্তর পশ্চিমাঞ্চলের বড় বড় ঘরে ও মহারাষ্ট্র প্রভৃতি দেশে গৃহস্থভবনেও প্রায় তাহার প্রচলন দৃষ্ট হয়। কিন্তু সাধারণ সমাজে বহুকালাবধি এদেশে

গীত বাদ্যের ব্যাপারে গুণ ও দোষ মিশ্রিত হইয়া পড়িয়াছে। ইহার যে বিশ্বব্যাপ্ত গুণ, সেই গুণের জন্য সকলেই ইহাকে ভালবাসে। কিন্তু সঙ্গীত-সংক্রান্ত কোনো কোনো দোষের নিমিত্ত অল্প লোকেই ইহার শিক্ষায় প্রবৃত্ত হয়। প্রায়ই দৃষ্ট হইয়া থাকে, যাহারা গানবাদ্য শিখে, তাহাদের মধ্যে অধিকাংশ লোকই অন্যকর্ম্মে উদাস, অপেক্ষাকৃত অধিক নির্লজ্জ, মাদকতা-প্রিয় এবং ইন্দ্রিয়াসক্ত। সঙ্গীতের আভ্যন্তরিক কোনো ধর্ম্মে ইহা ঘটে, কি দেশ কাল পাত্র দোষে ইহা হইয়া উঠে, এস্থলে তদ্বিচারে এখন প্রস্তুত নহি। কিন্তু যাহা বলিলাম, তাহার সত্যতাতে বোধ হয় কেহ আপত্তি করিতে পারিবেন না। তদ্ব্যতীত আর এক কথা আছে; ইউরোপের সঙ্গীত বিদ্যা ঐকতান-ধাতুমূলক, রাগরাগিণী-মূলক সঙ্গীতের তুলনায় অতি সামান্য, সুতরাং লোকে অপেক্ষাকৃত অল্প আয়াসেই আয়ত্ত করিতে পারে। ভারতবর্ষের সঙ্গীত শাস্ত্র অসীম, তাহাতে সুনিপুণ হইতে হইলে একপ্রকার অনন্যকর্ম্মা হইয়া কেবল তাহারই ধ্যান ও অভ্যাস করিতে হয়। দেখা গিয়াছে, যাহারা অল্প বয়সে গীতবাদ্য শিখিতে প্রবৃত্ত হয়, তাহাদের লেখা পড়া শিক্ষা বা অপর কার্য্যে পারদর্শিতা প্রায় কিছুই হয় না। এই সমস্ত নিগূঢ় দোষের জন্যই কেহ ইচ্ছাপূর্ব্বক আপন সন্তানকে সঙ্গীত শাস্ত্রাভ্যাসে নিযুক্ত করেন না; এই সব কারণেই গুরুলোকের সাক্ষাতে ও অনুমোদনে সে কাজ হয় না; এই সব প্রতিবন্ধকতাতেই অন্তঃপুরে তাহা প্রবেশ করিতে পারে না; এই জন্যই নির্লজ্জ কাজ বলিয়া তাহা গণ্য হয়; এবং ঐ সমুদয় কারণ একত্রিত হই-য়াই ব্যবসায়ীর শ্রেণী স্বতন্ত্র হইয়াছে, তাহারাই বিশেষ নিপুণতা লাভ করে।

যত কথা বলা হইল, উহা উচ্চ অঙ্গের অর্থাৎ কালোয়াতি গানের কথা। তদ্ব্যতীত বঙ্গদেশে সাধারণ মনোরঞ্জক কত প্রকার সঙ্গীত প্রণালীর সৃষ্টি হই-য়াছে, তাহা গণনা করা ভার। প্রত্যুত, এদেশের লোকের ন্যায় গানোন্মত্ত জাতি দ্বিতীয় আছে কিনা, বলিতে পারি না। যে দেশের বেদ অবধি গুরুপাঠ-শালের ধারাপাত পর্য্যন্ত স্বর সংযোগ ব্যতীত পঠিত হয় না; যে দেশের লোক স্তবপাঠ, চণ্ডীপাঠ, ও পুরাণপাঠ পর্য্যন্ত সুস্বরের সাহায্য ভিন্ন শ্রবণ করেনা; যে দেশে কীর্ত্তন, বাধাই, নগরসংকীর্ত্তন, পাঁচালি, কবি, যাত্রা, আখ্‌-ড়াই, হাফ্ আখ্‌ড়াই, তর্জ্জা, ভজন, মরিচা প্রভৃতি বিবিধ শ্রেণীর বিবিধ

প্রকার সঙ্গীত প্রচলিত হইয়াও তৃপ্তির শেষ হয় না; অধিক কি, যে দেশের দিবা-ভিক্ষু ও রা'ত্‌-ভিখারীরাও গান না শুনাইলে পর্য্যাপ্ত ভিক্ষান্ন পাইতে পারে না; সে দেশের সঙ্গীতামোদের মত্ততা বিষয়ে বিশেষ করিয়া বলিতে হইবে কেন? কিন্তু সুদ্ধ যদি এই আমোদেই দেশের লোক মগ্ন থাকিত, তবে কিনা হইত? তবে আমরা আমাদের পরম সৌভাগ্য স্বীকার করিতাম!

তবে কি হিন্দু সমাজ ক্রীড়া-প্রিয়? হাঁ তাহাও কিয়দংশে সত্য। পাশা, দাবা, তাস প্রভৃতি বিবিধ প্রকারের ক্রীড়া সর্ব্বদা সর্ব্বত্রই প্রচলিত। যদিও ইহারা সামান্যতঃ আলস্যবর্দ্ধক, কিন্তু অতিরিক্ত না হইলে সম্পূর্ণরূপে নির্দ্দোষ ও চিত্ততোষক বটে। প্রত্যুত, যদি তত্তাবতের শাদাশিদে ক্রীড়াতেই লোকে সন্তুপ্ত থাকিত, তাহাকেও পরম ভাগ্য বলিয়া মানিতাম। কিন্তু সকল সমাজের মধ্যেই কতকগুলি লোক থাকে, তাহারা উত্তম উপভোগকে অন্তিম সীমার পারে লইয়া গিয়া বিকৃত না করিয়া ছাড়ে না! পরিশ্রমের পর দুদণ্ড বসিয়া ভাল গান বাদ্য অথবা কোনোরূপ ভদ্র খেলা করা নিন্দনীয় হওয়া দূরে থাকুক বরং প্রকৃতি-মূলক, আনন্দজনক ও স্বাস্থ্য-বিধায়ক ব্যবহার। রিপু বিশেষের প্রাবল্যে কতক লোকে তাহার নির্দ্দোষ ভাবে সন্তুষ্ট না হইয়া ধন, মান, স্বাস্থ্য ও পারিবারিক শান্তি প্রভৃতি ধর্ম্মনাশক দ্যূত-ক্রীড়া, যাহাকে জুয়া খেলা বলে, দুর্ভাগ্যক্রমে তাহাতেই পুনঃ পুনঃ লিপ্ত হয়! সমস্ত ভারত-বর্ষে এই দোষাবহ ক্রীড়ার এত বৈচিত্র্য ও এত প্রাবল্য, যে, রাজপুরুষেরা তজ্জন্য স্বতন্ত্র দণ্ডনীতি স্থাপনে বাধ্য হইয়াছেন; তথাপি অদ্যাপি কিছুই করিয়া উঠিতে পারেন নাই! আশা ছিল, শিক্ষার প্রভাবে ইহার মূলোৎ-পাটন হইবে। কৈ? তাহারও সম্ভাবনা অল্প। যদিও সুশিক্ষিতের মধ্যে অনেকে এ সকল পাপে বিরত, কিন্তু অনেকেও আবার সম্পূর্ণ রত। বাহ্যে অত প্রকাশ পায় না, কিন্তু গোপনে গোপনে তাহাদের কাণ্ড ভয়ানক। ইহাই আমাদের দুরদৃষ্টের শেষ নহে;—বহু বহু সামাজিক পাপ বহু কালাবধি চলিয়া আসিতেছিল, তন্মধ্যে ব্যভিচার ও গাঁজা চরস প্রভৃতি মাদকতার অনুরাগ প্রধান। কিন্তু সে সব-বত থাকুক, এক্ষণে আবার নূতন সভ্যতার আমদানির সহিত যে একটী পান-দোষ সমাজকে আশ্রয় করিয়া বসিয়াছে, তাহার ন্যায় ভয়াবহ সর্ব্বশান্তিঘ্ন বুঝি অন্য সকল পাপের যোগ-ফলও হইতে পারে না!

আমরা এমন বলিতেছিনা, যে, ইংরাজ রাজত্বের পূর্ব্বে সুরার নামগন্ধও এদেশে ছিল না। বারুণী যে বহুপ্রাচীন কালেও এদেশের পরিচিতা দেবী, তাহা আমরা জানি। শাস্ত্রে যখন ইহার উল্লেখ আছে, তখন অবশ্যই ইনি কাহারও না কাহারও সেবিতা ছিলেন। আমরা জানিতাম দেবতারা যে বারুণীর সেবা করিতেন, সে এক প্রকার; দৈত্যেরা যাহাতে মত্ততা প্রাপ্ত হইত, সে আর এক প্রকার সুরা। অথবা এই জানিতাম, যে, যাহাদের পানোন্মত্ততা দোষ ছিল, তাহাদিগকে আর্য্যজাতি অসুর আখ্যা দিতেন। ঋষিপ্রণীত সংহিতা মধ্যে সকল পাপের প্রায়শ্চিত্ত লেখা আছে, কেবল ব্রাহ্মণ হইয়া সুরাপান রূপ ভয়ানক পাপে পাপী হইলে তাহার আর প্রায়শ্চিত্ত নাই। যদিও অদ্বিতীয় অনুসন্ধিৎসু বাবু রাজেন্দ্রলাল মিত্র মহাশয় সপরিবারে শ্রীকৃষ্ণ ও বলদেবের সম্পূর্ণ পান-দোষ প্রদর্শন করিয়াছেন, তথাপি তাহা বীরভাবাপন্ন ক্ষত্রিয় জাতির কাজ। সে যাহা হউক, ফল কথা পূর্ব্বকালে সুরা ছিল, কিন্তু বিরল ব্যবহার। এ সংস্কার সকলের হৃদয়েই বদ্ধমূল আছে। অপেক্ষাকৃত আধুনিক কালে হিন্দু-সমাজে ইহা যে অতি ঘৃণ্য পদার্থ ছিল, তাহাতেও সন্দেহ নাই। ইতিপূর্ব্বে বঙ্গদেশে ঘোর তান্ত্রিক মতাবলম্বী কোনো কোনো পরিবার কেবল অতি গোপনে মদ্রিকা ব্যবহার করিত, কিন্তু তাহাও প্রধানতঃ উন্মত্ততার জন্য নহে, সে কেবল কৌলিক ও তান্ত্রিক দৈবানুষ্ঠান বিশেষের সাধনোদ্দেশে, এই মাত্র। মত্ততার অনুরোধে কোনো কোনো স্থানে ইহার অল্প বিস্তর প্রচলন ছিল, তাহাও শুনা আছে—শুনা কেন, এক প্রকার দেখাও আছে। কিন্তু সমস্ত অধিবাসীর তুলনায় সেরূপ সুরাপায়ীর সংখ্যা এত অল্প ছিল, যে, তাহা ধর্ত্তব্যই নহে। এ বিষয়ে সাধারণ সমাজের কিরূপ প্রবৃত্তি, কিরূপ অভ্যাস এবং সুরাপায়ীদের প্রতি কি প্রকার চিত্তভাব ছিল, তাহাই দেখা কর্ত্তব্য। বিশ্বস্ত প্রাচীন লোকের মুখে শুনিয়াছি, যদি কেহ একাজ করিত, সে ব্যক্তি তরুণবয়স্ক হইলে ও তাহার পিতা জ্যেষ্ঠ ভ্রাতাদি বর্ত্তমান থাকিলে, তাহাকে বংশের ত্যজ্যপুত্র হইতে হইত। সে যদি বাটীর স্বয়ং কর্ত্তা হইত, তবে তাহাকে লোকে এক-ঘ'রে করিত। অন্ততঃ তাহার হাতে, কি তাহাকে লইয়া, কেহ আহার করিত না। মদ্রিকা-ত্যাগ ও সমুচিত প্রায়শ্চিত্ত ব্যতীত তাহার পক্ষে পূর্ব্বকার সামাজিক পদ লাভের সম্ভাবনা ছিল না।

আমরাও বাল্যকালে পল্লীগ্রামে ও এই রাজধানীতে দেখিয়াছি—তখন তো ইংরাজের রাজত্ব পুরাতন হইয়া উঠিয়াছে—তখন তো শ্রীযুক্ত নব সভ্যতা মহারাজ বঙ্গীয় সমাজে আপন সিংহাসন খানি পাতিয়া বসিয়াছেন! তথাপি তখন প্রকাশ্যতঃ কেহ একাজ করিয়া অব্যাহতি পাইতে পারিত না। প্রথমেই পাড়ায় গালাঘুসা উঠিত—"ওহে ভাই! শুনেছ, মদন নাকি মদ খাইতে শিখিয়াছে!" তদুত্তর প্রায় এইরূপ হইত "বল কি? না, এমন হবে না!" পুনর্ব্বার প্রথম বক্তা—"হ্যাঁ হে আমি অমুকের মুখে শুনেছি, তিনি তো মিথ্যা কবার লোক নন!" পুনর্ব্বার উত্তর "হায়! হায়! এমন ঘরে এমন সর্ব্বনাশ হ'লো!" পুনর্ব্বার প্রথম বক্তা "যেমন তেমন ঘর নয়, প্রাতঃস্মরণীয় রাজীবলোচনের বংশ!" পুনর্ব্বার উত্তর "মিন্সে আর মাগী শুনেছে?" পুনর্ব্বার প্রথম বক্তা "তাঁরা শুন্‌লে গলায় দড়ি দে ম'র্ব্বেন, কেন না লায়েক বেটা, ওরে তো তাড়াতে পা'র্ব্বেন না!" ইত্যাদি।

তাহার পর দলের কর্ত্তারা শুনিতে পাইলেই আকুণ্ডকুণ্ড বাঁধিত—প্রথমে তাঁহারা মদনকে ডাকাইয়া বুঝাইয়া পড়াইয়া সাবধান করিয়া দিতেন; মদন তাঁহাদের পায় হাত দিয়া শপথ করিয়া আসিত "এমন কর্ম্ম আর করিব না।" তাঁহারা সদয় চিত্তে ক্ষমাবান হইয়া প্রায়শ্চিত্তের পরামর্শ সহিত বলিয়া দিতেন "নিদান বাপু সংকল্প ক'রে গঙ্গাস্থানটাও ক'রো।" এই সতর্কতা ও এই শপথ যদি ব্যর্থ হইত, তবে পানকর্ত্তা মদনের পিতা ভ্রাতা অথবা গুরু লোক যে থাকুন, তাঁহাকে ডাকাইয়া তাঁহারা বিধিমতে সংশোধনের চেষ্টা পাইতেন এবং যাহাতে ঢলাঢলি না হয়, তাহার সম্যগ্‌ উপায় দেখিতেন। কিছুতেই নিবারণ না হইলে কাজেই শেষে এক ঘরিয়া বা দলাদলির ব্যাপার উপস্থিত হইত!

সর্ব্বস্থানেই যে এই পাপের প্রতি এত ভয়, এত ঘৃণা, এত দ্বেষ, এত সতর্কতা, এত শাসন ছিল, তাহা বলিতেছি না। কিন্তু অধিকাংশ স্থলেই এই গুলি কি এ প্রকারের কোনো কিছু ঘটিত তাহা নিঃসন্দেহ। হায়! ক্রমে সে দিন, সে অবস্থা, সে সমাজ অন্তর্হিত হইল! ক্রমেই ইংরাজী সভ্যতা মূর্ত্তিমান হইতে লাগিল! ক্রমেই এই গরলের সহস্র সহস্র পিপা জেতৃজাতিরা আনিতে লাগিলেন! ক্রমেই উপরিতন কর্ম্মচারীদের দ্বারা উত্তেজিত হইয়া অপকারী

আব্‌কারী দারোগারা দেশ মধ্যে মদের দোকান বাড়াইতে লাগিল! ক্রমেই ইংরাজ জাতির বাহ্যসভ্যতার দীপালোকে মুগ্ধ হইয়া ভ্রান্ত পতঙ্গবৎ নবশিক্ষিত তরুণগণ উল্লম্ফন পূর্ব্বক তাহাতে পতিত হইল! ক্রমেই এই সর্ব্বনাশের স্রোত ভয়ানক বেগে বাড়িতে লাগিল!

ব্রিটনজাতি আমাদের বিস্তর ভাল করিয়াছেন—তাঁহারা ভারত-ভূমিতে পূর্ব্ব স্বেচ্ছাচারের স্থানে ব্যবস্থামূলক সুশাসন আনিয়াছেন। তাঁহারা আমাদিগকে আইন দিলেন; শিক্ষা দিলেন; ধর্ম্ম, ব্যবহার, বাক্য ও লেখনীর স্বাধীনতা দিলেন; মুদ্রাযন্ত্র দিলেন; সুবিচার দিলেন; ধনী ও জমীদারাদি অত্যাচারীর হস্তে দীন দরিদ্র দুঃখী লোকের মান প্রাণ স্বাধীনতা রক্ষার উপায় দিলেন; ডাকাইত দমন করিয়া দিলেন; রাস্তা দিলেন, সেতু দিলেন; কলের গাড়ী চড়িতে দিলেন; তারে সংবাদ পাঠাইতে দিলেন; বিলাতে লইয়া গিয়া উচ্চ শিক্ষা ও উচ্চ পদ দিলেন; সর্ব্বোচ্চ বিচারালয়ে বসিতে দিলেন; সর্ব্বোচ্চ ব্যবস্থাপক সভায় বসাইয়া বিধান করিবার ক্ষমতা দিলেন; সর্ব্বোচ্চ চিহ্নিত কর্ম্মে প্রবিষ্ট হইতে দিলেন; সব দিলেন—সব করিলেন—সব মঙ্গলের পথ মুক্ত রাখিলেন; কিন্তু এত যে দিলেন—এত যে সব করিলেন; এক সুরাপানের পাপ ছড়াইয়া ও বাড়াইয়া পয়ঃকুম্ভে গোরচনা নিক্ষেপের প্রধান হেতু হইলেন! যত করিয়াছেন, এই এক মহা দোষে ভস্মে ঘৃত ঢালাই হইল! বরং আমাদিগকে শিক্ষা না দিতেন—উচ্চ পদ না দিতেন, সেও ভাল ছিল—বরং আমরা মূর্খ থাকিতাম—বরং আমরা সেই গুরু মহাশয়ের পড়ুয়া থাকিতাম—সেই আখুঞ্জির কাছে তুতিনামা পড়িতাম—সেইরূপে স্বেচ্ছাচারের অত্যাচার ভোগ করিতাম, সেও ভাল ছিল; তবু মদের সঙ্গে পদের সুখ, বিপদের হেতু বৈ আর কিছুই নয়! সেক্সপিয়ার, মিল্টন, মেকলে, মিল, হক্সলির জ্ঞান, "মণিনা ভূষিতঃ সর্প" বৈ আর কিছুই নয়—মদের সঙ্গে স্বাধীনতার সুখ পাপতাপের ভোগ বৈ আর কিছুই নয়!

হায়! আমাদের কত যুবক এই কয় বৎসরের মধ্যে কেমন বড় বড় গুণী হইয়া উঠিয়াছিলেন—কেহবা এমন লেখক হইয়াছিলেন, যে, তাঁহার সেই লেখনীর বলে দুর্দ্দান্ত শ্রীবৃদ্ধিকারী (অর্থাৎ শ্রীহারী) সাহেবেরাও কাঁপিতে লাগিল—কেহবা এমন রাজ-বিধিজ্ঞ হইয়াছিলেন, যে, গবর্ণর জেনেরলও

তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিয়া ব্যবস্থা করিতেন; যোগ্যতার পুরস্কার স্বরূপ তাঁহাকে সর্ব্বোচ্চ ব্যবস্থাপক সভায় আহ্বান করিয়াছিলেন (কিন্তু হায় বসিতে আর হইল না!); কেহবা এমন সুযোগ্য স্বদেশানুরাগী সুবাগ্মী হইয়াছিলেন, যে, রাজপুরুষেরা সেই যোগ্যতা দেখিয়া ও সেই বাগ্মীতা শুনিয়া স্বেচ্ছাচার-মূলক কত আজ্ঞা রহিত করিতে বাধিত হইয়াছিলেন! হায়! তাঁহারা সব কোথায় গেলেন? হায়! তাঁহারা তো বৃদ্ধ হন নাই, তবু কেন অকালে আমাদিগকে ছাড়িয়া গেলেন? হায়! বুক ফাটিয়া যায়; কালস্বরূপ পানদোষ যদি দেশে প্রবল হইতে না পারিত, তবে কি আমরা সে সব অমূল্য ধনে এখনি বঞ্চিত্ হই? স্মরণ উদ্দীপন জন্য অথবা নমুনা স্বরূপে বিশেষ করিয়া দুই তিনটী দৃষ্টান্ত দিলাম, কিন্তু কত যুবক যে এইরূপে এই সর্ব্বনেশে সুরার হাতে পড়িয়া দুর্ভাগা জনক জননী, স্ব স্ব প্রণয়িণী, বন্ধুবান্ধব ও সমাজের অপ্রতিবিধেয় ক্ষতি করিয়া চলিয়া যাইতেছে, কত শত আশার পাত্র যে অপাত্র হইয়া পড়িতেছে, কত শত উত্থানোন্মুখ সুকর্ম্মা সুনব্য পুরুষ যে অকর্ম্মণ্য হইয়া যাইতেছে, তাহার যদি তালিকা করিবার উপায় থাকিত, তবে সেই সংখ্যাপাত ও অশেষ গুণগ্রামের ধ্বংসাবশেষ দেখিয়া নৈরাশ্যে আর আতঙ্কে চমকিয়া উঠিতে হইত! আ'জ্ দেখিলাম, দিব্য শ্রীমান্, দিব্য কান্তি-পুষ্টি ধীমান্ বাবু নবীনচন্দ্র এম, এ, বি, এল্, মহাশয় নবোৎসাহে বিকশিত জ্ঞানচন্দ্রাভ-বদনে প্রাজ্ঞ অনুসন্ধিৎসুর ন্যায় সমাজের অভাব, আই-নের ত্রুটী, রাজকর্ম্মচারীর অন্যায়, পান দোষের সর্ব্বনাশক ফল বুঝাইয়া দিতেছেন এবং অকপট চিত্তে স্বদেশ-বাৎসল্য-ধর্ম্ম-পালনে দৃঢ়-প্রতিজ্ঞ হইয়া সহাধ্যায়ী পরীক্ষোত্তীর্ণ সমবয়স্কগণকে এই বলিয়া লওয়াইতেছেন, যে, "ভাই, জন্মভূমির এই সব শোচনীয় অবস্থা দেখিয়া যদি আমরা নিশ্চিন্ত হইয়া বসিয়া থাকি, তবে আমাদের লেখা পড়া শিখিবার ফল কি? ভাই, আমরা যদি প্রতীকারের চেষ্টা না করিব, কে করিবে? শিক্ষিতগণের সমবেত যত্ন ভিন্ন মাতৃভূমির উদ্ধারের দ্বিতীয় গতি দেখিতেছি না, ইত্যাদি।" এই বক্তৃতা শুনিয়া—চক্ষু মুখে অকপট অনুরাগের চিহ্ন দেখিয়া, মনে মনে কত আশাই করিলাম! ভাবিলাম, এই নবীন প্রবীণ হইলে দুর্দ্দিন আর থাকিবে না!

ইহারি ছয়মাস পরে একদিন সন্ধ্যার পর রাজপথ দিয়া চলিয়া যাই,

হঠাৎ এক অধঃপাতের স্থান হইতে নবীনের হো হো হাস্য—নবীনের সেই কণ্ঠস্বর আসিয়া শ্রুতি স্পর্শ করিল! অমনি চমকিয়া উঠিলাম—অমনি চরণ স্থগিত হইল! অমনি হস্তমুষ্টি হইতে যষ্টিগাছি স্খলিত হইয়া পড়িল! ভাবিলাম, একি? সেই নবীন এখানে? যে নবীন স্বদেশানুরাগ-ব্রতের স্বর্গীয় তপোধন—জন্মভূমির হিত সাধন-রূপ পবিত্র তপোবনই যাহার আশ্রম, সেই নবীন এই অগম্যা পুরীতে কেন? বুঝি আমার ভ্রম হইয়াছে—কিয়ৎকাল তিষ্ঠিতে হইল! এই চিন্তাতে মগ্ন হইয়া দাঁড়াইলাম—হৃদয়খানি ভগ্নপ্রায় হইয়া উঠিল! হৃৎপিণ্ডে যেন ঢেঁকির পাড়্ পড়িতে লাগিল! আঘাতপ্রাপ্ত শোণিত-স্থালীর ধড়ফড়ানি শব্দ স্পষ্ট যেন শ্রুত হইতে লাগিল! সমুদয় গায়ের রক্ত সঙ্গে লইয়া নৈরাশ্যের শঙ্কা আর অনিশ্চিতের সন্দেহ নক্ষত্র-গতিতে মস্তিষ্কে ছুটিল! কিন্তু সে যন্ত্রণা অধিকক্ষণ ভোগ করিতে হইল না—তৎক্ষণাৎ সেই স্বর আবার শুনিলাম—নিঃসন্দেহ নবীনের স্বর বটে! এবার আরো চমৎকার শুনিলাম—দুই এক পাত্রের পর যে প্রকার অস্বাভাবিক উৎসাহ হয়, অথচ মত্ততার জন্য তখনো আর দুই এক পাত্রের অপেক্ষা আছে, এমত অবস্থায় লোকে যে ভাবে, যে স্বরে কথা কহিয়া থাকে, নবীন ঠিক সেইরূপে বাক্য বিন্যাস করিতেছিল! নবীন কাহাকে কি উদ্দেশে কি বলিতেছিল, তাহাও শুনিলাম। নবীন যে ভাবে সহাধ্যায়ীগণকে ছয়মাস পূর্ব্বে স্বদেশের শুভব্রতে উত্তেজনা করিয়াছিল, অদ্যও সেইরূপ আগ্রহের সহিত নানা যুক্তি দিয়া একজন অনিচ্ছুক বন্ধুকে মদ্য-পানে লওয়াইতেছিল! নবীন বিদ্বান হইয়াছে, ন্যায়শাস্ত্র ভাল জানে, যুক্তিমার্গ উত্তমরূপে পরিষ্কার রাখিতে পারে, যখন যে কাজে লাগে তখন মন খুলিয়া লাগে, তাহার উপর মিষ্টভাষী। এমন লোক ব্রিটীসইণ্ডিয়ান এসোসিএসনের বা ভারতবর্ষীয় সভার সভ্য হইলে সভার অঙ্গরাগ কতবিধরূপে বাড়িতে পারে; এমন লোক পাপের পথে গেলে এক সপ্তাহে পাড়াসুদ্ধ লোককে মজাইতে পারে! ঐ অনিচ্ছুক বন্ধুকে নবীন মিষ্ট মিষ্ট করিয়া মহাব্যগ্র হইয়া এই বুঝাইতেছিল, যে, "ওহে ভাই, তুমি যে ব'ল্‌ছো, মদ বড় বিপদের কারণ, আমি তা স্বীকার করি। কিন্তু তবে তো আগুনও বিপদের কারণ! আগুন যদি ঘরে লাগে, তবে কি হয় ভাব দেখি! কিন্তু আগুনের মতন উপকারী আর কি আছে? (এই

আগুনে এ হয়, তা হয়, ইত্যাদি অনেক বলিল) যে ব্যক্তি সাবধানে ব্যবহার করিতে জানে, আগুন তাহার মহোপকারী হয় ; যে তা না পারে, তার সর্ব্বনাশ ঘটে। তেমনি ভাই, এই যাঁরে গ্লাসে ঢেলেছি, এঁরে যে ব্যবহার ক'র্ত্তে জানে, ইনি তাঁর মাতার স্বরূপ হিতৈষিণী হন—ব্যবহার না জা'ন্‌লেই বিপদ ঘটান! ইত্যাদি।”

কিন্তু আর না—প্রস্তাবটী অতি দীর্ঘ হইয়া উঠিয়াছে, সুতরাং উপসংহার প্রয়োজন। সকল কথাই একপ্রকার বলা হইয়াছে, উপসংহারে তত্তাবতের সার সঙ্কলন দ্বারা বাগাড়ম্বর বৃদ্ধির আবশ্যক বোধ করিলাম না। কেবল বিলাত-ফেরত যুবকগণকে সমাজে পুনঃগ্রহণ এবং তাহাদের প্রতিপাল্য আচার ব্যবহার সম্বন্ধে কিছু বলিবার ইচ্ছা ছিল, কিন্তু তাহা একটী অত্যন্ত গুরুতর বিষয়—এ প্রস্তাবে তদালোচনা না করিয়া শীঘ্রই তৎসম্বন্ধে স্বতন্ত্র লিপির বাসনা রহিল।

সমাপ্ত।